POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই যারা তোমার হাতে বায়'আত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই হাতে বায়'আত করে। আল্লাহর হাতই তাদের হাতের ওপর রয়েছে। অতএব যে কেউ তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে তো নিজেরই ক্ষতির জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। আর যে ব্যক্তি সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করে, যা সে আল্লাহর সঙ্গে করেছে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। (আল মায়েদা: ৭৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 11

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 5

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 29 Jan 2026 10 শাবান 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

পর্দার গুরুত্ব

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةُ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " احْتَجِبَا مِنْهُ " .فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং মাইমুনা (রাঃ)-ও সেখানে ছিলেন। আমরা দু'জন তাঁর কাছে বসে ছিলাম-এমন সময় আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম এসে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হন। এ ঘটনা সেই সময়ের, যখন আমাদের জন্য পর্দার বিধান ইতিমধ্যেই অবতীর্ণ ও প্রযোজ্য হয়ে গিয়েছিল। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা দু'জন তাঁর থেকে পর্দা করো।" আমি নিবেদন করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো অন্ধ-তিনি আমাদের দেখতে পারেন না এবং আমাদের চিনতেও পারেন না।" তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাঁকে দেখছ না?

(সুনান আত-তিরমিজি, কিতাবুল আদব, অধ্যায়: পুরুষদের থেকে নারীদের পর্দা সম্পর্কে)

হযরত জারির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন-অপরিচিত (নন-মাহরাম) নারীর দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে কী করা উচিত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।"

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, অধ্যায়: দৃষ্টি সংযমের নির্দেশ সম্পর্কে)

যখন কোনো পর-পুরুষ ও পর-নারী একান্তে একত্রিত হয়, তখন তাদের তৃতীয় সঙ্গী হয় শয়তান।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম) বলেন-

"বর্তমান যুগে পর্দা প্রথার ওপর নানা আক্রমণ করা হয়। কিন্তু এরা জানে না যে ইসলামী পর্দা কোনো কারাগার নয়-অর্থাৎ এটি কোনো বন্দিশালা নয়। বরং এটি এমন এক প্রকার সংযম, যার মাধ্যমে পর-পুরুষ ও পর-নারী একে অপরকে দেখা থেকে বিরত থাকে। পর্দা পালন করা হলে মানুষ নৈতিক পদস্খলন থেকে রক্ষা পায়। যে কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি স্বীকার করতে পারেন যে, যেসব সমাজে পর-পুরুষ ও পর-নারী অবাধে মেলামেশা করে, কোনো সংযম ছাড়াই একত্রে মিলিত হয় এবং প্রকাশ্যে একসঙ্গে চলাফেরা করে, সেখানে মানবিক কামনা-বাসনার তাড়নায় তাদের নৈতিকভাবে হোঁচট খাওয়া অনিবার্য।

বারবার দেখা গেছে এবং শোনা গেছে যে, এ ধরনের সমাজে পর-পুরুষ ও পর-নারীর একই ঘরে একান্তে অবস্থান করাকেও-এমনকি দরজা বন্ধ থাকলেও-কোনো দোষ হিসেবে গণ্য করা হয় না। এটিকেই আবার 'সভ্যতা' বলে উপস্থাপন করা হয়। এইসব ক্ষতিকর পরিণতি রোধ করার উদ্দেশ্যেই ইসলামের শরিয়তদাতা এমন সব কার্যকলাপেরই অনুমতি দেননি, যা মানুষের নৈতিক পতনের কারণ হতে পারে। সেই অনুযায়ী বলা হয়েছে যে, যখন কোনো পর-পুরুষ ও পর-নারী একান্তে একত্রিত হয়, তখন তাদের তৃতীয় সঙ্গী হয় শয়তান।

এই অবাধ ও লাগামহীন শিক্ষাব্যবস্থার-অর্থাৎ অতিরিক্ত স্বাধীনতায় পরিপূর্ণ শিক্ষার-ফলে ইউরোপ যে অশুচি পরিণতি ভোগ করছে, সে বিষয়ে চিন্তা করো; যেখানে লজ্জা ও শালীনতা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং কোথাও কোথাও প্রকাশ্যেই লজ্জাজনক ও ব্যভিচারমূলক জীবনযাপন করা হচ্ছে। এগুলোই এ ধরনের শিক্ষার ফল। যদি তোমরা কোনো বস্তুকে বিশ্বাসঘাতকতা বা নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে চাও, তবে তার যথাযথ সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু যদি তা সংরক্ষণ না করো এবং এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করো যে মানুষ স্বভাবতই সৎ, তবে নিশ্চিত জেনে রেখো-সে বস্তু অবশ্যই ধ্বংস হবে।"

তিনি আরও সতর্ক করে বলেছেন যে, এই ভ্রান্ত আত্মতুষ্টিতে ভোগা উচিত নয় যে সমাজ ঠিক আছে, কেউ দেখছে না, অথবা বর্তমান পরিবেশে পর্দার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ লোকজন দেখার অভ্যাস রাখে না। তিনি বলেন, যদি কেউ কেবল এই ধারণা পোষণ করে যে মানুষ ভালো, তবুও তাকে এই আশঙ্কা রাখা উচিত যে অবক্ষয় অনিবার্যভাবেই ঘটবে। (মালফূযাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯-৩০, নতুন সংস্করণ)

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا এর তফসীর

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

সূরা নূর-এর ৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

বস্তুত, "إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"-এর অধীনে কেবল সেই অংশটুকু প্রকাশ করা বৈধ, যা কোনো অনিবার্য প্রয়োজনের কারণে অনাবৃত রাখতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো জমিদার পরিবারের নারী মুখে সম্পূর্ণ নিকাব পরিধান করে কৃষিশ্রম বা জমিদারি-সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করতে পারেন না। এ ধরনের ক্ষেত্রে কাজ সম্পাদনের সুবিধার্থে তাঁর জন্য হাত এবং চোখ থেকে নাক পর্যন্ত মুখমণ্ডলের অংশ অনাবৃত রাখা বৈধ হবে। তবে যেসব নারীর এ ধরনের কাজ করার প্রয়োজন নেই এবং যারা কেবল ভ্রমণ বা অবসরযাপনের উদ্দেশ্যে বাইরে যান, তাঁদের জন্য বিধান হলো-তাঁরা মুখ আবৃত রাখবেন।

অতএব, "যা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়-এর অর্থ হলো সেই অংশ, যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায় এবং কোনো বিশেষ প্রয়োজনের কারণে গোপন রাখা সম্ভব নয়-এই প্রয়োজন স্বাভাবিক গঠনগত কারণেও হতে পারে, যেমন উচ্চতা (যা নিজেও এক ধরনের শোভা হলেও তা গোপন করা অসম্ভব; সুতরাং শরিয়ত এর প্রকাশকে নিষিদ্ধ করে না), অথবা চিকিৎসাগত প্রয়োজনে হতে পারে, যেমন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দেহের কোনো অংশ চিকিৎসককে দেখাতে হওয়া। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) এ পর্যন্ত বলেছেন যে, কোনো চিকিৎসক একজন নারীকে পরামর্শ দিতে পারেন যে তিনি মুখ ঢাকবেন না, কারণ মুখ ঢাকলে তাঁর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে, এবং তাঁকে চলাফেরা করার নির্দেশ দিতে পারেন; এমন পরিস্থিতিতে যদি সেই নারী মুখ অনাবৃত রেখে চলাফেরা করেন, তাও বৈধ হবে।

এছাড়া, কিছু ফকীহের মতে, যদি কোনো নারী গর্ভবতী হন এবং কোনো দক্ষ ধাত্রী পাওয়া না যায়, এবং চিকিৎসক এ কথা জানান যে যোগ্য চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সন্তান প্রসব না করলে তাঁর জীবন বিপন্ন হবে, তবে সে অবস্থায় পুরুষ চিকিৎসকের সহায়তায় সন্তান প্রসব করাও বৈধ হবে। বরং, যদি কোনো নারী পুরুষ চিকিৎসকের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করতে অস্বীকৃতি জানান এবং এর ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে, তবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনি আত্মহত্যাকারীর ন্যায় গুনাহগার হিসেবে গণ্য হবেন।

আরও বলা যায়, পেশাগত প্রয়োজনের কারণেও এমন বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হতে পারে-যেমন জমিদার পরিবারগুলোর নারীদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে-যাদের পক্ষে পুরুষ স্বজনদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সহায়তা না করলে জীবিকা নির্বাহ সম্ভব হয় না। এ ধরনের সকল পরিস্থিতিই "যা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়-এর আওতাভুক্ত।

(তাফসীর কাবীর, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪৮৮, সূরা আন-নূর, আয়াত ৩২-এর তাফসীরের অধীনে)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ একজন আহমদীর জাতীয় কর্তব্য

হযরত আমীরুল মুমিনীন (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রদত্ত তাঁর জুমার খুতবায় সকল আহমদীকে–বিশেষত ওয়াকফে–জিন্দেগী (যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন)–তাদের জাতীয় ও ধর্মীয় দায়িত্ব দাওয়াতে ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা)–এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দাওয়াতে ইলাল্লাহ–এর শর্তাবলি ও শিষ্টাচার বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর বলেন, আজও বিশ্বের মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক–চতুর্থাংশেরও কম। এর মূল কারণ হলো প্রজ্ঞার সঙ্গে ইসলামের প্রচার না করা এবং ইসলামের বার্তাকে তার যথার্থ ও সঠিক রূপে বিশ্বের নিকট উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়া।

তিনি উল্লেখ করেন, মুসলমানরা প্রায়ই মনে করে যে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের বার্তা প্রচার করা যায়; অথচ জিহাদের অনুমতি কেবল তখনই দেওয়া হয়েছে, যখন শত্রু আক্রমণ করে। তিনি আরও বলেন, মুসলমানদের সাধারণ অবস্থা এমন যে তারা কেবল তরবারির জোরে ইসলাম বিস্তার করতে চায়; অথচ অভ্যন্তরীণভাবে তারা এত গভীর মতভেদে জড়িয়ে আছে যে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা তো দূরের কথা, একে অপরের পা টেনে ধরার ফুরসত থেকেই তারা মুক্ত নয়। ফলে মুসলমানরা দ্বৈত এক সংকটে আবদ্ধ–প্রথমত, মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ দলাদলি, যার পরিণতিতে পারস্পরিক চরম শত্রুতা; দ্বিতীয়ত, জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের ভুল ধারণা। তিনি বলেন, এই দুই কারণই মুসলমানদের সঠিক পথে অগ্রসর হওয়া থেকে ক্রমাগতভাবে বিরত রাখছে।

হযরত আকদাস মসীহে মওউদ (আ.) মুসলমানদের উদ্দেশে এভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন–

"এখন ছেড়ে দাও জিহাদের ধারণা, হে বন্ধুগণ,
দীনের জন্য এখন যুদ্ধ ও রক্তপাত হারাম।"

এর পাশাপাশি, আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত হাকাম ও আদল হিসেবে তিনি মুসলমানদের পারস্পরিক মতভেদ নিরসনের সমাধানও উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম উলামারা এই উভয় শিক্ষাই প্রত্যাখ্যান করে, যার ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর উলামা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়–

"আল–উলামা হুম শাররু মান তাহতা আদীমিস সামাচ–অর্থাৎ আকাশের নীচে তাদের উলামারাই হবে সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি। আরও বলা হয়েছে যে, তাদের অবস্থা শূকর ও বানরের ন্যায় হয়ে যাবে।

অতএব, আজ ইসলামের প্রচারের দায়িত্ব একমাত্র জামা'আতে আহমদিয়্যার ওপরই বর্তায়; কেননা হযরত আকদাস মসীহে মওউদ (আ.) জামা'আতকে দাওয়াতে ইলাল্লাহ–এর অস্ত্রসমূহ এবং সেগুলো প্রয়োগের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত আকদাস আমীরুল মুমিনীনের এই খুতবা প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের জন্য–বিশেষত ওয়াকফে–জিন্দেগীদের জন্য–সময়ের এক অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন। উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে হযরত আমীরুল মুমিনীন (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন–

"আমাদের সবসময় এ বিষয়টি সামনে রাখা উচিত এবং নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করা উচিত। আমরা যে হযরত মসীহে মওউদ (আ.)–এর হাতে বায়'আত করেছি এবং তাঁর সঙ্গে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি, তার দাবি হলো–আমরা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলব, তাঁর শিক্ষাকে শিখব, নিজে তার ওপর আমল করব এবং একই সঙ্গে এই বার্তা বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছে দেব।"

তাবলিগ বা প্রচারের বিষয়ে হযরত আমীরুল মুমিনীন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন, যা সংক্ষেপে নিম্নরূপ। তিনি বলেন–

"যারা তাবলিগ করে, তারা কখনও কখনও রাগের বশে প্রতিপক্ষের ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে। তাদের স্মরণ রাখা উচিত–আমাদের তাবলিগ সর্বদা নৈতিকতার সীমার মধ্যেই হতে হবে। তাদের কাছে যুক্তি নেই বলেই তারা অশোভন ভাষা ব্যবহার করে; কিন্তু আমরা যদি একই ভাষা ব্যবহার করি, তবে তার অর্থ দাঁড়ায়–আমাদের কাছেও কোনো যুক্তি নেই।"

এছাড়াও হুযূর দাওয়াতে ইলাল্লাহ–এ নিয়োজিতদের উপদেশ দেন–এমনভাবে কথা বলতে হবে, যাতে অপর ব্যক্তি তা বুঝতে পারে এবং তার ভুল ধারণা দূর হয়। তিনি আরও বলেন, মুবাল্লিগদের উচিত সত্যের অনুকূলে কথা বলা–যা ঘটনাবলির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাতে কোনো অতিশয়োক্তি না থাকে। তিনি এ উপদেশও দেন যে, বিভিন্ন যুক্তির মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ও শক্তিশালী যুক্তিটিকে ভিত্তি ও কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং অন্যান্য যুক্তিকে তার অধীনস্থ রাখতে হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ছিল–

"প্রচারে সর্বদা নিয়োজিত থাকতে হবে–এটাই আসল ফল। আমাদের কাজ প্রচার করা। ফল নির্ণয় করা ও প্রভাব সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার কাজ।"

তিনি আরও বলেন, প্রচারে অবিচল থাকতে হবে; ক্লান্ত হওয়া চলবে না। এমন নয় যে একদিন ক্যাম্প বা স্টল বসিয়ে প্রচার করলাম এবং তারপর কাজ শেষ। বরং ধারাবাহিকভাবে প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন–যেমন ওষুধের ক্ষেত্রে একেকটি ওষুধ একেক রোগী বা রোগের জন্য উপকারী, তেমনি প্রতিটি কথা বিশেষ ভঙ্গিতে বিশেষ ব্যক্তির জন্য উপকারী হতে পারে; সবার সঙ্গে একইভাবে কথা বলা সমীচীন নয়।

হুযূর ঘোষণা করেন–বর্তমান যুগে দাওয়াতে ইলাল্লাহ–ই জিহাদ। হযরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেছেন–এখন জিহাদ কলমের মাধ্যমে হবে; তোমাদের কলমের অগ্রভাগই তরবারির অগ্রভাগ। অতএব, এর মাধ্যমেই জিহাদ করো। বিশেষভাবে মুরব্বিদের উদ্দেশে হুযূর বলেন–মুরব্বিদের ওপর এক বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাদের কাজ কেবল জামা'আতের তরবিয়ত (নৈতিক প্রশিক্ষণ) করা নয়; বরং সেই তরবিয়তের পাশাপাশি মানুষকে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করা। যেখানে তারা এটি করবে, সেখানে তাদের জ্ঞানও বৃদ্ধি করবে এবং এই জিহাদের জন্য তাদের প্রস্তুতও করবে। তখনই তারা নিজেদের অঙ্গীকার পূরণকারী হবে।

প্রচার কার্যক্রমের নীতিমালা শিক্ষা দিতে গিয়ে হুযূর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো তুলে ধরেন– প্রথমত, একজন মুরব্বির মধ্যে আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়্যাতুন নফস) থাকা আবশ্যক।

তার তাহাজ্জুদ নামাজের অভ্যাস থাকা উচিত এবং জামা'আতকেও ইবাদতের দিকে মনোযোগী করতে হবে।

তিনি নিজে গভীরভাবে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করবেন এবং জামা'আতের সদস্যদেরও অধ্যয়নের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন।

তিনি নিজে আল্লাহর যিকরের প্রতি মনোযোগী হবেন এবং জামা'আতকেও এদিকে মনোযোগী করবেন। ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বর্তমানে বই পড়ার প্রবণতা কমে গেছে, তথাপি ধষরংষধস ওয়েবসাইটে বহু মূল্যবান গ্রন্থ উপলব্ধ রয়েছে–সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে।

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে যে দুর্বল পাবলিক রিলেশনস প্রচার ক্ষেত্রকে সীমিত করে দেয়। খুব কম লোকই সম্পর্ক বৃদ্ধির দিকে যথাযথ মনোযোগ দেয়।

অন্যায়ের প্রতিবাদে নৈতিক সাহস সৃষ্টি করতে হবে।অধ্যবসায়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

চিন্তা–ভাবনার অভ্যাস গড়ে তুলে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

হুযূর উপসংহারে বলেন–

"যদি এসব গুণ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তবে আমরা এক মহান বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হব। তখনই আমরা বিশ্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর পতাকা উত্তোলনের যোগ্য হব, এবং তখনই আমরা মুসলমানদেরকে আগমনকারী মসীহে মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদীর বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত করতে পারব এবং তাদেরকে তাঁর বায়'আতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাতে পারব।"

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে দাওয়াতে ইলাল্লাহ সম্পর্কে হুযূরের উপদেশসমূহের ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

(সীরাত খাতামুন নবিয়্যিন, পৃষ্ঠা ৪৪–৪৬, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)–এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

জুমআর খুতবা

"সে মানুষ, যে নিজের সত্তা, নিজের গুণাবলি, নিজের কার্যকলাপ, নিজের আমল এবং নিজের পবিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের প্রবল স্রোতের মাধ্যমে জ্ঞান ও কর্মে, সত্যনিষ্ঠা ও অবিচলতায় পরিপূর্ণ উৎকর্ষের এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শ উপস্থাপন করেছেন এবং এভাবেই 'ইনসানে কামিল' নামে অভিহিত হয়েছেন৷ সেই বরকতময় নবী হলেন নবীদের সীল, পবিত্রদের নেতা, নবীদের গৌরব-মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। হে প্রিয় প্রভু! এই প্রিয় নবীর ওপর এমন রহমত ও দরুদ বর্ষণ করো, যা তুমি সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আর কারও ওপর বর্ষণ করোনি।"

(হযরত মির্জা গোলাম আহমদ, মসীহে মাওউদ আলাইহিস সালাম)

আদর্শ তো তারাই হয়ে থাকে, যারা কোনো বিষয়ের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্ষেত্রে-হোক তা আল্লাহ তাআলার অধিকার কিংবা বান্দাদের অধিকার-উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সেই সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, যার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রদান করেছেন। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই রাসূল তোমাদের জন্য এক উত্তম আদর্শ (উসওয়া)। শুধু তাঁর কথা শোনাই যথেষ্ট নয়; বরং সেগুলোর ওপর আমল করো। কেবল ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়। আর যখন তোমরা আমল করবে, তখন অবশ্যই সেই মর্যাদা অর্জন করতে পারবে, যে উদ্দেশ্যে আমি এই রাসূলকে প্রেরণ করেছি।

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ? আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। সুতরাং আমাদের উচিত তাঁর জীবনকে এমন গুরুত্ব দেওয়া, যাতে আমরা তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক অনুসরণ করার চেষ্টা করি। তাঁর প্রতিটি নির্দেশই কুরআন কারিমের বিধানসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই এসেছে। অতএব মানুষের মধ্যে যে কোনো নৈতিক গুণ বিদ্যমান হতে পারে বা থাকা উচিত-বরং আল্লাহ তাআলার গুণাবলির যে প্রতিফলন মানুষের মাঝে সম্ভব-তার পরিপূর্ণ ও মৌলিক নমুনা হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)।

তিনি কখনোই আল্লাহ তাআলার অধিকার-অর্থাৎ ইবাদতের অধিকার-অবহেলা করেননি। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাঁর জীবনে নানা কঠিন পরিস্থিতিও এসেছে। তাঁকে যুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছে, শত্রুরা আক্রমণও করেছে; তবুও আল্লাহ তাআলার ইবাদতের অধিকার আদায়ে তিনি কখনোই শৈথিল্য দেখাননি।

তিনি ? শিক্ষা দিয়েছেন যে, উচ্চতর নৈতিকতা হলো মানুষের স্বাভাবিক শক্তিসমূহের সঠিক ব্যবহার। এই স্বাভাবিক শক্তিগুলোকে সম্পূর্ণ দমন করে দেওয়া বোকামি; সেগুলোকে অবৈধ কাজে নিয়োজিত করা পাপাচার; আর সেগুলোর প্রকৃত ও সঠিক ব্যবহারই হলো নেকি। এটাই তাঁর শিক্ষার সারসংক্ষেপ এবং এটাই তাঁর নিজস্ব পবিত্র জীবনেরও সারকথা। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করো।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে কখনো এমন কোনো অবস্থা আসেনি, যেখানে তাঁর সামনে দুটি পথ খোলা ছিল এবং তিনি সেগুলোর মধ্যে সহজ পথটি বেছে নেননি-শর্ত এই যে, সহজ পথটি গ্রহণ করার মধ্যে পাপের কোনো আশঙ্কা যেন না থাকে।

এমনকি যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে শাসনক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছিলেন, তখনও তিনি সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কেউ যদি তাঁর সঙ্গে কঠোর আচরণ করত, তিনি নীরব থাকতেন এবং কখনো কঠোরতার জবাব কঠোরতা দিয়ে দিতেন না।

তাঁর সহনশীলতার অবস্থা এমন ছিল যে, কখনো কখনো তিনি কোনো কাজে বের হলে কিছু লোক পথে তাঁকে থামিয়ে দাঁড়াত এবং নিজেদের প্রয়োজন-আবেদন পেশ করতে শুরু করত। তিনি ততক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন, যতক্ষণ না তারা তাদের কথা শেষ করত; এরপরই তিনি সামনে অগ্রসর হতেন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (১২ ফতাহ, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا (الاحزاب:22)

(সূরা আল-আহযাব: ২২

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই আয়াতের অনুবাদ হলো: "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকাল বা শেষ দিনের (সাক্ষাতের) আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক হারে স্মরণ করে।"

হযরত আয়েশা (রা.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, মহানবী (সা.)-এর সু মহান চরিত্র এবং তাঁর পবিত্র আদর্শ সম্পর্কে কিছু বলুন। হযরত আয়েশা (রা.) উত্তর দেন, তুমি কি কুরআন মজীদ পড়ো নি? তাতে তো আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাঁর (সা.) আদর্শ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন: وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (সূরা আল-কলম: ৫) অর্থাৎ "হে রসূল! নিশ্চয়ই তুমি নৈতিক চরিত্রের সর্বোচ্চ মানে অধিষ্ঠিত।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৪৪-১৪৫)

বস্তুত আদর্শ বা নমুনা তো তারাই হয়ে থাকে যারা কোনো বিষয়ে সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে। মহানবী (সা.)-এর ক্ষেত্রে তা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য আদায়ের বিষয় হোক বা আল্লাহ্র বান্দাদের অধিকার আদায় হোক-উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সেই সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন যার সাক্ষ্য আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং দিয়েছেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বলেছেন যে, এই রসূল তোমাদের জন্য আদর্শ। তাঁর কথা কেবল শুনবেই না, বরং সেগুলোর ওপর আমলও করবে। অর্থাৎ কেবল ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়, সে অনুসারে কাজ করলে তোমরা অবশ্যই সেই মর্যাদাও লাভ করতে পারবে যার জন্য আমি এই রসূলকে পাঠিয়েছি।

তাই এটি প্রত্যেক মুসলমান তথা মু 'মিনের দায়িত্ব । পৃথিবীতে এমন লোকও আছে যারা সামান্য কিছু ভালো কাজ করে বা কথা বলে যা প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তাদের নামের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাদের অনেক সম্মাননা ও পুরস্কার দেওয়া হয়। কেউ নোবেল পুরস্কার পাচ্ছে, কেউ অন্য কিছু । কিন্তু এই পুরস্কার কোনো কমিটি বা সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় যা সেই কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে। তবে এমনটি কখনো হয় নি যে, পুরো জাতি কোনো একটি বিষয়ে একমত হয়ে কোনো স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্রকৃত পুরস্কার তো সেটি যা মহানবী (সা.)-কে যৌবনে নবু ওয়তের পূর্বে তাঁর জাতির লোকেরা 'সাদিক' (সত্যবাদী) এবং 'আমীন' (আমানতদার) উপাধি প্রদানের মাধ্যমে দিয়েছিল।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস-৪৯৭২)

তাঁর কোনো পার্থিব পুরস্কারের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে তিনি এমন এক সুউচ্চ মর্যাদায় উপনীত ছিলেন যার কোনো তুলনা নেই , এবং পুরো জাতি তাঁকে সেই উপাধিতে ভূষিত করেছিল। অতএব এটিই সেই সুউচ্চ মর্যাদা যা কেবল মহানবী (সা.)-এর রয়েছে। মহানবী (সা.) নিজেও বলেছেন, তোমরা আমার সুন্নতের অনুসরণ করো এবং আমার কর্ম অনুযায়ী চলো।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস-৪৬০৭)

কারণ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সংশোধনের জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। মহানবী (সা.) আরো বলেন, উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে। (আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩১৮)

সুতরাং চরিত্রের পূর্ণতা কেবল তিনিই দান করতে পারেন যিনি নিজে এই সকল গুণাবলির আধার হয়ে থাকেনএবং যাঁর সত্তায় সকল সদ্‌গুণ বিদ্যমান থাকে।

যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেছেন যে, তিনি (সা.) আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ । তাই আমাদের উচিত তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শকে আমাদের জন্য সেই মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা যেন আমরা তাঁর প্রতিটি নির্দেশের ওপর আমল ক রতে পারি। আর তাঁর প্রতিটি কথা কুরআন করীমের নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং চারিত্রিক গুণ যা কোনো মানুষের মধ্যে থাকতে পারে বা থাকা উচিত, অথবা আল্লাহ্ তা'লার যে-সকল ঐশী গুণ রয়েছে, মহানবী (সা.) হলেন সেগুলোর বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-ও 'দীবাচা তাফসীরুল কুরআন'-এ কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন এবং আমাদের সীরাতগ্রন্থগুলোতেও তাঁর চরিত্র ও সীরাত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। আজ আমি সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করছি; ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করব।

প্রথম বিষয়টি হলো আল্লাহ্ তা'লার হক অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের হক। এক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর মাঝে আমরা কেমন আদর্শ দেখতে পাই? আমরা দেখি যে, রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর সারাটি জীবন খোদাপ্রেমে কেটেছে। তাঁর ওপর অনেক বড়ো বড়ো দায়িত্ব ছিল- নতুন শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের তরবিয়ত করা, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ(আ.) বলেছেন- তিনি (সা.) অসভ্যদের মানুষ বানিয়েছেন, সু শিক্ষিত মানুষ বানিয়েছেন এবং তাদের আল্লাহ্ ওয়ালা মানুষে পরিণত করেছেন। (লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২০৬)

এটি অনেক বড়ো কাজ ছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র যে হক অর্থাৎ ইবাদতের দায়িত্ব ছিল- তা কখনো বিস্মৃত হন নি। এটি খুবই বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সুদীর্ঘ সময়ে তাঁকে (সা.) অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানেও যেতে হয়েছে, শত্রুরা আক্রমণও করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালনে তিনি কখনোই সামান্যতম বিচ্যুতি বা ত্রুটি করেন নি।

অতএব এই হলো সেই আদর্শ যা আমাদের সামনে বিদ্যমান যে, আমরা যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লাকে আমাদের সামনে রাখি। আর আল্লাহ্ তা'লাকে আমাদের সামনে রাখলেআমাদের বিভিন্ন সমস্যা আপনাআপনিই সমাধা হতে থাকবে। মানুষ বলে, আমাদের এই সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যা রয়েছে; আমরা অমুক ভাবে দোয়া করেছি, তমুক ভাবে দোয়া করেছি। তারা নিজেদের সমস্যার জন্য দোয়া করে। কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আদায় করি না, যার ফলে মানুষ বঞ্চিত থেকে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার প্রাপ্য প্রদান করো। তাঁর (সা.) ইবাদতের মান কেমন ছিল?

মহানবী (সা.) কিছুটা রাত বা অর্ধেক রাত অতিবাহিত হতেই আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লাও এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একবার এমন এক সময়ে যখন তিনি ইবাদতের জন্য দাঁড়াচ্ছিলেন, তঁাকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লার কাছে তো আপনি আগে থেকেই অত্যন্ত প্রিয় ও নৈকট্যভাজন, তবুও কেন আপনি নিজেকে এত কষ্টের মুখে ঠেলে দেন? রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতে কাটিয়ে দেন এবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কান্নাকাটি করতে থাকেন? তখন তিনি (সা.) বলেন, হে আয়েশা! اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا (অর্থাৎ আমি কি এক কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?)।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৮২)

এটি সত্য কথা যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন এবং আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমাকে এই নৈকট্য দান করেছেন; কিন্তু এটি কি আমার কর্তব্য নয় যে, সাধ্যমতো তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? কারণ কৃতজ্ঞতা তো অনুগ্রহের বিনিময়েই প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা হলো, তিনি তাঁকে সর্বশেষ শরীয়তবাহী নবী বানিয়েছেন, তাঁর ওপর সর্বশেষ কিতাব পূর্ণ করেছেন এবং শরীয়তকে পূর্ণতা দান করেছেন- এসবের কারণে তিনি এই কথা বলেছেন যে, আমি কি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব না? অথচ নিজ নিজ অবস্থানে প্রত্যেক মানুষের ওপরই আল্লাহ্ তা'লা প্রভূত অনুগ্রহ করে রেখেছেন। এই কৃতজ্ঞতার দাবি হলো, আমরা যেন নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করি। মানুষজন প্রশ্ন করে থাকে, যুবকরাও আসে এবং জিজ্ঞেস করে, আমরা কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করব? আমাদের ইবাদতের আল্লাহ্ তা'লার কী প্রয়োজন? বর্তমান বস্তুবাদিতায় প্রভাবিত হয়ে শিশুরাও এসব প্রশ্ন করছে।

এর উত্তর হলো, আল্লাহ্ তা'লার তোমাদের ইবাদতের প্রয়োজন নেই; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর যেসব অনুগ্রহ করেছেন- তা কি এই দাবি করে না যে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো এবং কৃতজ্ঞ বান্দা হও?

একইভাবে তাঁর (সা.) জীবনচরিতে এই ঘটনাও পাওয়া যায় যে, যখন তিনি আল্লাহ্ তা'লার কালাম (কুরআন) শুনতেন, তখন অবলীলায় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতো; বিশেষ করে সেই আয়াতগুলো শুনলে যেখানে তাঁর দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)-কে বলেন, আমাকে কুরআন শরীফ পড়ে শোনাও। তিনি বলেন, আমি নিবেদনকরলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কুরআন করীম তো আপনার প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি আপনাকে কী শোনাবো? তিনি বলেন, আমি অন্যদের কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি। হযরত আব্দু ল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেন, তখন আমি সূরা আন -নিসা পাঠ করে শোনাতে আরম্ভ করলাম। যখন আমি পড়তে পড়তে নিম্নের আয়াতে পৌঁছলাম: فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا (সূরা আন-নিসা: ৪২) অর্থাৎ "তখন কী অবস্থা হবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে তাদের নবীকে তাদের জাতির সামনে উপস্থিত করে সেই জাতির হিসাব নেবো এবং তোমাকেও তোমার জাতির সামনে উপস্থিত করে তাদের হিসাব নেবো?" তখন রসূলু ল্লাহ্ (সা.) বলেন, থামো, থামো! সাহাবী বলেন, আমি যখন তাঁর দিকে তাকালাম তখন দেখলাম, তাঁর দুই চোখ বেয়ে টপ টপ করে অশ্রু ঝরছে। তাঁর ওপর গভীর খোদাভীতি ছেয়ে যায়। সেই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবেই তাঁর মনে উম্মতের চিন্তাও ছিল যে, আমার উম্মত যেন এমন কোনো কাজ না করে বসে যা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হবে এবং তখন আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হবে। সুতরাং এ বিষয়ের একটি দিক হলো, যেখানে তঁ ার সাক্ষ্য দেবার জন্য আরো অনেক বিষয় রয়েছে, সেখানে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত যে, মহানবী (সা.)-এর সাক্ষ্য যেন আমাদের বিরুদ্ধে না যায়।

আমাদের অবস্থা যেন এমন না হয় যা আমাদের গুনাহসমূহকে ফুটিয়ে তুলবে এবং আমরা আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির সম্মুখীন হব। অতএব, এটি অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। আমাদেরও ইবাদতের হক আদায় করা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সেই ভালোবাসা রাখা করা উচিত যা মহানবী (সা.) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে আমাদেরকে যার নির্দেশ দিয়েছেন।

নিয়মিত নামাযের বিষয়টিই দেখুন, এর প্রতি তাঁর (সা.) এতটাই খেয়াল ছিল যে,চরম অসুস্থ অবস্থায় জীবনের শেষ দিনগুলোতেও যখন শুয়ে নামায পড়ার অনুমতি থাকে, ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে গিয়েছেন। একদিন যখন তিনি আসতে পারেন নি, তখন তিনি হযরত আবু বকরকে (রা.) নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। এরই মাঝে তিনি যখন দেখলেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা কিছুটা ভালোর দিকে, তৎক্ষণাৎ দুইজন মানুষের সাহায্য নিয়ে মসজিদের দিকে রওনা হন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, সেই সময়ও অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর দুই পা মাটিতে ছেঁচড়ে যাচ্ছিল।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৮৩)

কিন্তু বাজামা'ত নামাযের গুরুত্ব তাঁর দৃষ্টিপটে ছিল। তিনি উম্মতকে এটি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি সেই কষ্ট সহ্য করেছেন। পা টেনে টেনে তিনি সেখানে পৌঁছেন। মসজিদে চলে যান, নিজের অসুস্থতার পরোয়া করেন

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

নি। অতএব এটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর ভালোবাসার চিত্র। আর এই প্রসঙ্গে তিনি মানুষের তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণও কীভাবে করতেন! একটি তো হলো নিয়মিত নামাযের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ, আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্যও তাঁর মর্যাদা মানুষের হৃদয়ে কীভাবে গেঁথে দিতে হয়।

আরবদের মাঝে রীতি ছিল, দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তালি বাজানো হতো। সেই যুগে এটি একটি সাধারণ রীতি ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) এই প্রথা বিলুপ্ত করে বলেন, এর পরিবর্তে যিকরে ইলাহী বা আল্লাহ্র স্মরণ হওয়া উচিত।

এই বিষয়ে বর্ণিত আছে, একবার রসূলু ল্লাহ্ (সা.) কোনো একটি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, ইতোমধ্যে নামাযের সময় হয়ে যায়। তিনি (সা.) বলেন, আবু বকরকে বলো, নামায পড়িয়ে দিতে। এরই মাঝে তিনি (সা.) সেই কাজ শেষ করেন এবং তৎক্ষণাৎ মসজিদের দিকে রওয়ানা হন। যখন তিনি মসজিদে পৌঁছেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) নামায পড়াচ্ছিলেন। যখন লোকেরা বুঝতে পারে যে, তিনি (সা.) মসজিদে এসে গেছেন, তখন মুসল্লিরা ব্যাকুল হয়ে হাততালি দিতে আরম্ভ করে। এর মাধ্যমে একদিকে তো এটি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর আগমনে তাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ, আর অন্যদিকে হযরত আবু বকর (রা.)-র দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, এখন আপনার ইমামতি শেষ হয়ে গেছে, কারণ রসূলু ল্লাহ্ (সা.) উপস্থিত হয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) পেছনে সরে আসেন আর মহানবী (সা.)-এর জন্য ইমামের স্থান ছেড়ে দেন। নামাযের পর মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর! আমি তোমাকে নামায পড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছি, তাই পেছনে আসার হেতু কী? হযরত আবু বকর (রা.)-র নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখুন!

তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্র রসূলের উপস্থিতিতে আবু কুহাফার পুত্র এমন কী মর্যাদা রাখে যে, নামায পড়াবে? অতঃপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের হাততালি দেবার উদ্দেশ্য কী ছিল? আল্লাহ্র যিকর বা ইবাদতের সময় হাততালি দেওয়া সংগত নয়। নামাযে যদি এমন কোনো বিষয় ঘটে যেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক হয়, তখন হাততালি দেবার পরিবর্তে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করো;'সুবহানাল্লাহ্' বলা উচিত। তোমরা এমনটি করলে স্বভাবতই অন্যদের মনোযোগ সেই ঘটনার প্রতি নিবদ্ধ হবে।

একইভাবে তিনি (সা.) কৃত্রিম ইবাদতও পছন্দ করতেন না।

ইবাদতের প্রতি এত মনোযোগ আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তিনি বলতেন, কৃত্রিমতা থাকা উচিত নয়। একবার তিনি(সা.) বাড়িতে গিয়ে দেখেন, দুই খুঁটির মাঝে একটি রশি ঝুলছে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, এই দড়ি কেন বাঁধা হয়েছে? লোকেরা বলে, এটি হযরত যয়নব (রা.)-র দড়ি। ইবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি এই দড়িতে ভর দিয়ে ইবাদত করেন। মহানবী(সা.) বলেন, এমনটি করা উচিত নয়; এই দড়ি খুলে ফেলো। প্রত্যেকের উচিত ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত করা যতক্ষণ সে স্বাচ্ছন্দ্যে করতে পারে। ক্লান্ত হয়ে গেলে যেন সে বসে যায় বা বিশ্রাম নেয়। এ ধরনের কৃত্রিম ইবাদত কোনো কাজে আসে না।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৮৪)

এর মাধ্যমে প্রথমত এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর (সা.) তরবিয়তের প্রভাবে নারী সাহাবীগণ এবং তাঁর (সা.) পরিবার পরিজন ও বাড়ির সদস্যরাও ইবাদতের প্রবল আগ্রহ রাখতেন আর নিজেদেরকে কষ্টেও নিপতিত করতেন। অপরদিকে তিনি (সা.) এটিও বলেছেন, (নিজেকে) কষ্টে নিপতিত করার প্রয়োজন নেই, বরং স্বাচ্ছন্দ্যের সীমায় থেকে ইবাদত করো। তবে বর্তমান যুগের মানুষের জন্য এটিও বলে দিচ্ছি, এর অর্থ এটিও নয় যা বর্তমান যুগের লোকেরা কখনও কখনও বলে থাকে যে, কষ্টে নিপতিত করার কোনো প্রয়োজন নেই, দ্রুত নামায পড়ো। ফরয ইবাদতযেহেতু, তাই কোনোমতে পালন করো, ঘাড় থেকে বোঝা নামাও! আর [মহানবী (সা.)-এর]এই কথাটির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে যে, নিজের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য রাখো।

বর্তমানে কোনো কোনো নামাযী ইবাদত করতে আসে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে নামায পড়ে চলে যায়। অথবা বাড়িতে নামায পড়ার সময় কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করে ফেলে। প্রায়শ এখানেও মানুষ আমাকে প্রশ্ন করে, নামায কীভাবে পড়া উচিত? নামায মনোযোগের সাথে ও সুন্দরভাবে পড়া উচিত।

এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীস আছে, তিনি (সা.) একজন সাহাবীকে (একই) নামায তিন-চার বার পড়ার জন্য আদেশ দেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে বিলম্বে এসেছিলেন। তিনি (সা.) নামায পড়ে বৈঠকে বসেছিলেন,বাজামা'ত নামায শেষে বৈঠক শুরু হয়েছিল। প্রত্যেকবার সেই সাহাবী নামায শেষ করে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসলে তিনি (সা.) তাকে বলতেন, যাও! পুনরায় নামায পড়ো। পুনরায় সে নামায পড়ে আসলে তিনি (সা.) বলতেন, যাও! আবার নামায পড়ো। এভাবে তিন-চার বার তিনি (সা.) তাকে নামায পড়ার নির্দেশ দেন। সেই সাহাবী যখন নিবেদন করেন, এর চেয়ে উত্তমভাবে নামায পড়ার পদ্ধতি আমি জানি না; আপনি আমাকে বলুন, কীভাবে পড়তে হবে।

মহানবী (সা.) বলেন, নামায ধীরেসুস্থে ও বুঝেশুনে পড়ো। আল্লাহ্র যিকর করো, দরূদ পাঠ করো, তৌহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদের ঘোষণা ও গুণকীর্তন করতে হবে। রুকু ও সিজদাও সঠিকভাবে করা উচিত।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৭৯৩)

কাজেই এ কথাটিও স্মরণ রাখুন। স্বাচ্ছন্দ্যে নামায পড়ার অর্থ এটি নয় যে, (এই যুক্তিতে) দ্রুত (নামায) পড়ে নেবে যে, একটিরেওয়ায়েতে রয়েছে, স্বাচ্ছন্দ্যে নামায পড়ো। আমার ঘুম পাচ্ছিল তাই আমি দ্রুত কয়েক মিনিটে নামায পড়ে নিয়েছি! অসচেতন অবস্থায় তো এমনিতেই নামায পড়া বারণ। এমনটি সংগত নয়। বরং যখন নামায পড়বে তখন এর দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করতে হবে; এরও তিনি (সা.) উপদেশ দিয়েছেন।

শিরকের প্রতি তাঁর এতটা ঘৃণা ছিল যে, মৃত্যুকালে তিনি (সা.) যখন জীবনের অন্তিম মুহূর্তে কষ্টে ছটফট করছিলেন, তখন তিনি কখনো ডানে আবার কখনো বাম পাশে ফিরছিলেনএবং ক্রমাগতভাবে বলছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি অভিসম্পাত করুন যারা তাদের নবীদের সমাধিকে মসজিদে পরিণত করেছে।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৮৫)

অর্থাৎ তারা নবীদের কবরে সিজদা করে এবং তাঁদের কাছে দোয়া বা যাচনা করে। তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, আমার মৃত্যুর পর আমার জাতি যদি এমন কাজ করে তাহলে যেন এটি মনে না করে যে, তারা আমার দোয়ার ভাগীদার হবে; বরং আমি তাদের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হব। যেমনটি পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সাক্ষী বানাবেন।

এখন লক্ষ করুন! এ কারণেই মদীনায় তাঁর পবিত্র মাজারে সরকার কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে, কাউকেই সিজদা করতে দেয় না, এমনকি কাছেও ভিড়তে দেয় না, কিন্তু অনেক মুসলমান দেশে পীর-ফকিরদের দরবারে সিজদা দেওয়া হয় এবং বুযুর্গদের কাছে মানত করা হয়। এই আচরণ হলো শিরক। যে কাজ করতে মহানবী (সা.) বারণ করেছেন এবং নিজের বেলায়ও বারণ করেছেন, তাহলে অন্য কোনো পীর-ফকির অথবা বুযুর্গদের কী এমন অধিকার রয়েছে যে, তাদের সমাধিতে সিজদা করতে হবে? আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার মাধ্যমে এসব কাজ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি বটে, কিন্তু ইবাদতের প্রকৃত মানে উপনীত হওয়া এখনো বাকি। কিন্তু অন্য মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকহারে এই প্রথা প্রচলিত আছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতিও করুণা করুন এবং তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন যেন তারা এই শিরক থেকে বিরত থাকতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনয়ের মান দেখুন, যখন লোকজন তাঁকে (সা.) বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি তো আপনার আমল বা কর্মের বদৌলতে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করবেন, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে (চারিত্রিক) সনদ প্রদান করেছেন ও আপনার অনুপম চরিত্রের প্রশংসা করেছেন এবং আপনার জীবনাদর্শকে মুসলমানদের আমলের একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। কাজেই এর অর্থ হলো, আপনার কর্ম এমন যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন অথবা ক্ষমা করে দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন, না না! আমিও আল্লাহ্র অনুগ্রহেই ক্ষমা লাভ করব। আবার হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি একদিন মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সা.) বলছিলেন, কোনো মানুষ তার কর্মের দরুন জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনিও কি আপনার কর্মের কল্যাণে জান্নাতে প্রবেশ করবেন না? তিনি (সা.) বলেন, আমিও নিজের কর্মবলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না। তবে যদি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ আমাকে আবৃত করে নেয়, তাহলে সেটি ভিন্ন কথা।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৮৬-৩৮৭)
(সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুখারী, হাদীস-৫৬৭৩) এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

এরপর তিনি (সা.) উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেন, নিজের কর্মকাণ্ডে পুণ্য অবলম্বন করো এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের পথ অন্বেষণ করো। আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে কোনো মানুষ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। যদি সে পুণ্যবান হয় তাহলে জীবদ্দশায় সে নিজের পুণ্যে আরো অগ্রগামী হবে আর যদি খারাপ (মানুষ) হয় তাহলে বেঁচে থেকে সে তার পাপ থেকে তওবা করার সৌভাগ্য লাভ করবে, (এ বিষয়ে) মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তামান্না, হাদীস-৭২৩৫)

মহান আল্লাহ্র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ যা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। কখনো মৃত্যু কামনা করা উচিত নয়। এর কারণ তিনি (সা.) এটি বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোনো কষ্টের কারণে তুমি এই কাজ করো; [কারণ কোনো কষ্টের ফলেই সাধারণত মানুষ মৃত্যু কামনা করেথাকে;] আর তোমার মধ্যে যদি কোনো পুণ্য থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে আরো অধিক পুণ্য করার তৌফিক দান করবেন আর পরকালে তোমার জন্য আরো উত্তম ব্যবস্থা করবেন, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি কোনো পাপের অভ্যাস থেকে থাকে তাহলে তোমরা তওবা ও ইস্তেগফারের সুযোগ লাভ করবে যদি এদিকে তোমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, আর পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে; এভাবেও তোমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করবে। আর যখন সময় আসবে তখন আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সাথে এমন ব্যবহার করবেন যে, হয়ত তোমাদের মার্জনার উপকরণও সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাঁর (সা.) নিজের ইবাদতের মান কেমন ছিল তা তো আমরা দেখলাম। এছাড়া তিনি(সা.) অন্যদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করতেন।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, একবার তিনি(সা.) রাতের বেলা তাঁর জামাতা হযরত আলী এবং কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-র বাড়ি যান এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা তাহাজ্জুদের নামায পড়ো তো? হযরত আলী (রা.) উত্তরে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা তো করি, কিন্তু যখন আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমাদের চোখ না খোলে তখন তাহাজ্জুদ পড়া হয় না। তিনি (সা.) বলেন, তাহাজ্জুদ পড়বে; আর একথা বলে নিজের বাড়ির দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি (সা.) বার বার এ কথাই বলতে থাকেন وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (সূরা আল্ -কাহাফ: ৫৫) অর্থাৎ, মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের ভুল স্বীকার করতে চায় না এবং বিভিন্ন ধরনের যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে নিজের দোষ ঢাকার চেষ্টা করে।

অতএব, তিনি (সা.) একথা তাদের সামনেও বলেন, তাদেরকে বুঝান আর ফেরত আসার সময়েও একথা পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন, যেন অন্যরাও হযরত আলী (রা.)-র কাছে একথাটি পৌঁছে দেয়। তিনি (সা.) তাদেরকে এ শিক্ষাই দেন যে, এ কথা বলার পরিবর্তে তাদের বলা উচিত ছিল, কখনো কখনো আমাদের ভুল হয়ে যায়, তখন আমরা উঠতে পারি না। কিন্তু তারা এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার ওপর চাপিয়ে দেন যে, যদি আল্লাহ্ চান তাহলে আমরা জাগ্রত হই, নতুবা আমরা ঘুমিয়ে থাকি। তিনি এটিই বলতে চেয়েছেন যে, নিজের দোষ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরোপ করা উচিত নয়? যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, ইবাদতের ক্ষেত্রেও কোনো ধরনের কৃত্রিমতা বা ভনিতা তাঁর পছন্দ ছিল না। যেমনটি একবার তিনি (সা.) নিজের বাড়িতে দড়ি টাঙানো দেখতে পেয়ে তাদেরকে এমনটি করতে বারণ করে বলেন, এই দড়ি খুলে ফেলো।

তাঁর নীতি বা আদর্শ ছিল, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মাঝে যে শক্তিসামর্থ্য সৃষ্টি করেছেন সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা উচিত আর এটিই প্রকৃত ইবাদত।

দৃষ্টিশক্তি থাকা অবস্থায় চোখ বন্ধ করে নেওয়া বা সেটি উপড়ে ফেলা (কোনো) ইবাদত নয়, বরং এটি একটি অসম্মানজনক আচরণ। তবে এর অপব্যবহার হচ্ছে পাপ। বর্তমানে দেখুন! পৃথিবীতে এমন অনেক বিষয় রয়েছে, মানুষের কামনাবাসনা রয়েছে, বিভিন্ন আকর্ষণ রয়েছে যা আমাদেরকে সেগুলোর দিকে আকর্ষণ করে। আমরা যদি সেগুলোর প্রতি আকর্ষণ রাখি, যেমন বিভিন্ন নোংরা অনুষ্ঠান টিভি বা ইন্টারনেটে দেখি অথবা কোনো অসমীচীন প্রোগ্রাম দেখি, তাহলে এটি পাপ। তিনি (সা.) বলেছেন, এই পাপ থেকে দূরে থাকাই মূল কাজ আর এটিই তোমাদেরকে পুণ্যের ভাগীদার বানাবে। একইভাবে কান বন্ধ করে রাখা কোনো পুণ্যকাজ নয়। আল্লাহ্ তা'লা যে ইন্দ্রিয় শক্তি দিয়েছেন, সেটি কেন নষ্ট করবে? বরং এটি তো এক প্রকার ধৃষ্টতা। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে একটি নিয়ামত দিয়েছেন, অথচ তোমরা সেটি নষ্ট করছ। তবে মানুষের গীবত ও পরচর্চা শ্রবণ করা পাপ। এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা অন্যের গীবত করেও এবং পরনিন্দা শোনেও, মানুষের সম্পর্কে ভ্রান্ত কথা শোনে এবং আনন্দ পায়, উপভোগ করে, মানুষের দুর্বলতা এবং মন্দ কথা শুনে বিদ্রুপও করে। এসব কাজ অন্যায় এবং পাপ। এ সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন, এমন কাজ করবে না।

তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিবৃত্তির সঠিক ব্যবহারের নামই হচ্ছে উন্নত নৈতিক চরিত্র আর এই স্বভাবজ শক্তিনিচয়কে বিনষ্ট করা হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা। এগুলোকে অন্যায় কাজে নিয়োজিত করা হচ্ছে পাপ আর এগুলোর প্রকৃত ও যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে পুণ্য। এটি হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার সারমর্ম এবং এটিই তাঁর নিজের জীবনের সারাংশ। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা আদর্শ হিসেবে এটিকে [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শকে] অবলম্বন করো।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

হযরত আয়েশা (রা.) এক স্থানে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে বলেন, তাঁর (সা.) জীবনে কখনো এমন কোনো পরিস্থিতি আসে নি যেখানে তাঁর (সা.) সামনে দুটি পথ খোলা ছিল আর তিনি সেগুলোর মধ্য থেকে সহজ পথটি বেছে নেন নি- যতক্ষণ না সেই সহজ পথে কোনো পাপের আশঙ্কা থাকত।

অর্থাৎ যখন দুটি পথ থাকত- একটি সহজ ও একটি কঠিন- তখন তিনি সহজ পথটিই গ্রহণ করতেন। কারণ আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে অকারণে কষ্টে ফেলতে চান না। কিন্তু যখনই তাঁর (সা.) মনে সামান্যতম সন্দেহ হতো যে, সহজ পথটি অবলম্বন করলে কোনো পাপ সংঘটিত হতে পারে, তখন তিনি তা এড়িয়ে কঠিন পথটি বেছে নিতেন। বরং বলা যায়, সামান্য সন্দেহ হলেই তিনি এমনভাবে তা থেকে দূরে সরে যেতেন যে, মানুষের মধ্যে কেউই তাঁর মতো এতটা দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করার সামর্থ্যই রাখত না।

এখন দুনিয়ার দিকে তাকালে দেখা যায়, অনেক সময় মানুষ অন্যদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্টের মধ্যে ফেলে নিজের বড়াই জাহির করতে চায় যে, আমরা কত চেষ্টাসংগ্রাম করছি, হেন করেছি তেন করেছি! অনেক পীর-ফকিরও এ ধরনের কথা বলে;নানা কাহিনি রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) সহজ পথই অনুসন্ধান করেছেন। কারণ যারা পৃথিবীকে দেখানোর জন্য এভাবে কথা বলে এবং নিজের মহত্ব প্রকাশ করার জন্য কিংবা প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে নিজেকে কষ্টে নিপতিত করে থাকে, তারা আল্লাহ্র জন্য তা করে না। আল্লাহ্ তা'লারও তাদের কষ্টবরণে কিছু যায়-আসে না, আর তারা এর জন্য কোনো পুণ্যেরও ভাগীদার হয় না। এসব মূলত মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য করা হয়। আর মানুষ যখন ধোঁকা দেবার অভিপ্রায়ে কোনো কাজ করে তখন সেই দুরভিসন্ধির কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পুণ্যের নয় বরং পাপের ভাগীদার করেন। কিছু মানুষ তাদের দোষত্রুটি ঢাকার জন্যঅনেক ঢাকঢোল পেটায় যে, আমরা এই করেছি, সেই করেছি। কোনো না কোনোভাবে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে এবং নিজেদের প্রশংসা করে বলে যে, আমরা মস্ত বড়ো কাজ করেছি এবং এ কারণে আমরা ভীষণ কষ্টের মধ্যে পড়েছি। এরা এসব কাজের ঘটা করে প্রচার করে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, না, এই (তথাকথিত) পুণ্য কাজগুলো আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদান করবে না, বরং আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হবে। কারণ তোমাদের নিয়ত বা সংকল্প পরিষ্কার নয়। তোমরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য এমনসব কাজ করে ফেলো। তোমরা মনে করো, আমরা মানুষকে দেখাতে পারলে হয়ত লোকেরা আমাদের পক্ষ নেবে। সুতরাং এসব ছোটো ছোটো শিক্ষা মহানবী (সা.) আমাদেরকে তাঁর আদর্শের মাধ্যমে এবং উপদেশের মাধ্যমেও শিখিয়েছেন। মানুষের সাথে উত্তম আচরণের বিষয়টি তিনি নিজের পরিবার থেকেই শুরু করতেন। তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে আচরণ কেমন ছিল? অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ও ন্যায়সংগত আচরণ ছিল। বর্তমান যুগের মানুষ যদি এটি হৃদয়ঙ্গম করে, তাহলে পারিবারিক বহু ঝগড়া ও অশান্তি দূর হয়ে যাবে। কখনো কখনো তাঁর স্ত্রীরা তাঁর সঙ্গে কঠোরতাও করতেন, অর্থাৎ কঠোরভাবে কথা বলতেন, অসন্তুষ্টি নিয়ে কথা বলতেন; কিন্তু তিনি (সা.) তা নীরবে হাসিমুখে এড়িয়ে যেতেন।

একদিন মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, হে আয়েশা! তুমি যখন আমার সাথে রাগ করো তখন আমি বুঝে ফেলি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আপনি কীভাবে বুঝে ফেলেন? তিনি (সা.) বলেন, তুমি যখন আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকো তখন কসম করার প্রয়োজন হলে সর্বদা বলো, মুহাম্মদের প্রতিপালক-প্রভুর কসম! আর যখন তুমি আমার ওপর রাগ করো এবং কসম করার দরকার হয় তখন বলো, ইবরাহীমের প্রতিপালক-প্রভুর কসম! একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) হেসে ফেলেন এবং তাঁর (সা.) কথার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আপনি একেবারে ঠিক ধরেছেন।

এরপর মহানবী (সা.)-এর প্রথম ও জ্যেষ্ঠতমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.)-র ঘটনাবলি রয়েছে। তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। তার (রা.) মৃত্যুর পরে মহানবী (সা.) যুবতী মহিলাদের সাথেও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)-র স্মৃতি ভোলেন নি। হযরত খাদীজা (রা.)-র বান্ধবীরাও যখন ঘরে আসতেন মহানবী (সা.) তাঁদের স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতেন।

আর হযরত খাদীজা (রা.)-র হাতের তৈরি কোনো জিনিস তাঁর (সা.) কাছে এলে অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতেন।

বদরের যুদ্ধের ঘটনা। তাঁর (সা.) এক জামাতা বন্দি হয়ে আসেন; তিনি তখনো মুসলমান হন নি। আর মুক্তিপণ পরিশোধ করার মতো সম্পদ তার কাছে ছিল না। তার স্ত্রী অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কন্যা যখন দেখলেন, আমার স্বামীকে রক্ষা করার জন্য আর কোনো সম্পদ নেই, তখন একান্ত নিরুপায় হয়ে তিনি তার

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

কাছে থাকা মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন গলার একটি হার স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে মদীনা পাঠিয়ে দেন। সেই হারটি যখন মহানবী (সা.)-এর সামনে নিয়ে আসা হয় তখন তিনি (সা.) তা দেখে চিনে ফেলেন এবং অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। তিনি (সা.) সাহাবীদের বলেন, আমি তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি না, কারণ এমন আদেশ দেওয়ার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমি জানি, গলার এই হারটি যয়নবের কাছে থাকা তার মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। তোমরা যদি সানন্দে সম্মত হও তবে আমি সুপারিশ করছি, কন্যাকে তার মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু থেকে যেন বঞ্চিত করা না হয়। সাহাবীরা (রা.) জবাবে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের জন্য এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে? কাজেই তারা (রা.) গলার সেই হারটি হযরত যয়নবকে (রা.) ফিরিয়ে দেন।

হযরত খাদীজা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে যে সদ্‌ব্যবহার করেছিলেন তার প্রভাব এত সুগভীর ছিল যে, তিনি (সা.) প্রায়ই স্ত্রীদের কাছে তার (রা.) কথা বর্ণনা করতেন।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, স্ত্রীদের মাঝে পারস্পরিক সামান্য মনোমালিন্য দেখা দেয়। [একজন স্ত্রী প্রয়াত হলেও তার যদি বেশি প্রশংসা করা হয় তাহলে অন্যরা ঈর্ষান্বিত হয়।] মহানবী (সা.) একবার হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে হযরত খাদীজা (রা.) প্রশংসা করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কেন এই বৃদ্ধার কথা সবসময় স্মরণ করতে থাকেন? এখন তার (রা.) কথা বাদ দিন! আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে তার (রা.) চেয়ে উত্তম যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রীদের দান করেছেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি (সা.) বলেন, আয়েশা! তুমি জানো না, খাদীজা আমার কী পরিমাণ সেবা করেছে!

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৮৯-৩৯৩)

মহানবী (সা.)-এর উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণগত মান কেমন ছিল- তা ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের সামনে আসে। তাঁর (সা.) জন্মের পূর্বে পিতা আর পরে শৈশবেই মাতা মৃত্যুবরণ করেন। প্রথম আট বছর তিনি (সা.) তাঁর দাদার তত্ত্বাবধানে লালিতপালিত হন। এরপর তিনি (সা.) তাঁর চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্বে লালিতপালিত হন। চাচার সাথে রক্তের সম্পর্কও ছিল এবং তার (অর্থাৎ আবু তালিবের) পিতাও মৃত্যুকালে মহানবী (সা.)-এর স্বপক্ষে বিশেষভাবে ওসিয়্যত করেছিলেন। একারণে তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিশেষ ভালোবাসা রাখতেন আর তাঁর (সা.) প্রতি যত্নবান ছিলেন। কিন্তু চাচির মাঝে সেরূপ স্নেহবাৎসল্য কিংবা বংশকুলের প্রতি দায়িত্ববোধ ছিল না। ঘরে কোনো জিনিস আসলে চাচি প্রায়শই নিজ সন্তানদের প্রথমে দিতেন এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি খেয়াল রাখতেন না।অথচ তিনি (সা.) তখনো শিশুই ছিলেন। আবু তালিব বাড়ি ফিরলে ভাতিজাকে কান্নারত অবস্থায় দেখা অথবা অভিযোগ-অনুযোগ করতে দেখার পরিবর্তে দেখতে পেতেন, তার নিজের সন্তানরা কোনো না কোনো খাবার খাচ্ছে, অথচ তার ছোট্টো ভাতিজা পাহাড়ের মতো গাম্ভীর্যনিয়ে এক কোণায় বসে আছে। অর্থাৎ মহানবী (সা.) শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সবকিছু সহ্য করতেন। চাচার স্নেহ ও পারিবারিক দায়িত্ব যখন সামনে এসে দাঁড়াতো তখন তাঁর (সা.) চাচা দৌড়ে ভাতিজাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং বলতেন, আমার সন্তানটির দিকেও একটু খেয়াল কোরো! আমার সন্তানটির প্রতিও একটু খেয়াল রেখো!' প্রায়শ এমনটি ঘটত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লেখেন, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, রসূলু ল্লাহ্ (সা.) কখনো অভিযোগ করেন নি, তাঁর চেহারায় কখনো বিষণ্ন তার ছাপ দেখা যায় নি। এ কারণে তিনি খিটখিটেও হন নি এবং নিজের চাচাতো ভাইদের সঙ্গে কখনো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁ ার হয় নি। বরং তাঁর জীবনই সাক্ষ্য দেয়- পরবর্তীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি হযরত আলী ও হযরত জাফরকে নিজের তত্ত্বাবধানে লালন পালন করেন এবং সর্বতোভাবে তাঁদের কল্যাণের ব্যবস্থা করেন।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৯৩)

বর্তমান যুগের সাথে তুলনা করে দেখুন, মানুষ বড়ো হয়ে যাবার পরও ছোটোবেলার কথা মনে রেখে প্রতিশোধ নিতে থাকে; কিন্তু তিনি (সা.) সর্বদা উত্তম আচরণই প্রদর্শন করেছেন। বর্তমানে আমরা দেখি, এমনকি বড়ো হয়ে বোঝার বয়সে পৌঁছেও কেউ যদি বাধ্য হয়ে অন্য আত্মীয়দের কাছে থাকতে যায়, অনেক সময় বাবা না থাকায় চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই থাকতে হয় বা অন্য কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে থাকতে হয়; সেখানে যদি আত্মীয়দের পক্ষ থেকে কোনো অবিচার হয়, তবে তারা সেসব কথা ভুলতে পারে না এবং সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নিতে থাকে। কিন্তু মহানবী (সা.) কখনো প্রতিশোধ নেন নি, বরং সুযোগ পেলে তাদেরকে নিজের বুকে স্থান দিয়েছেন, তাদের লালনপালন করেছেন এবং তাদেরকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান দিয়েছেন। উচ্চ নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধৈর্যের একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন।

একবার এক নারী- যার ছেলে মারা গিয়েছিল এবং সে তার কবরের পাশে বসে বিলাপ করছিল। মহানবী (সা.) সেই পথে যাওয়ার সময় বলেন, হে নারী! ধৈর্য ধরো। সবার ওপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রাধান্য রাখে। সেই নারী মহানবী (সা.)-কে চিনত না। সে জবাবে বলল, আমার সন্তানের মতো যদি তোমার সন্তানও মারা যেত, তবে তুমি বুঝতে ধৈর্য কাকে বলে! তখন মহানবী (সা.) শুধু এতটুকু বলে সেখান থেকে চলে যান যে, একটি নয়- আমার সাত সাতটি সন্তান মারা গেছে!

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৯৪)

অতএব এমন পরিস্থিতিতে তথা অতীতের দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ করে শুধু এতটুকুই প্রকাশ করতেন, কিন্তু কখনো এর বেশি কিছু বলেন নি। আর সেই শোকের কারণে কখনোই মানবসেবায় অবহেলা করেন নি।

মহানবী (সা.)-এর সহনশীলতার স্বরূপ দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁকে শাসনক্ষমতা দান করেন তখনো তিনি সবার কথা শুনতেন। কেউ কঠোর আচরণ করলেও তিনি নীরব থাকতেন এবং কখনো কঠোরতার জবাব কঠোরভাবে দিতেন না।

ইতিহাসে লেখা আছে, মুসলমানরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নাম ধরে না ডেকে তাঁর আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা দৃষ্টিপটে রেখে 'হে আল্লাহ্‌র রসূল' বলে ডাকতেন। আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সে সময়কার রীতি অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করত; তাঁকে 'মুহাম্মদ' বলে না ডেকে 'আবুল কাসেম' (অর্থাৎ কাসেমের পিতা) বলে ডাকত, যা ছিল তাঁর ডাক নাম। কারণ তাঁর এক পুত্রের নাম কাসেম ছিল- যিনি ইন্তেকাল করেছিলেন।

একবার এক ইহুদী মদীনায় এসে তাঁর সঙ্গে বিতর্ক শুরু করে। বিতর্কের সময় সে বার বার বলছিল, হে মুহাম্মদ! কথাটা এরূপ; হে মুহাম্মদ! বিষয়টা এরূপ। মহানবী (সা.) নিঃসংকোচে তার কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সাহাবীরা তার এই ধৃষ্টতা দেখে অস্থির হয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এক সাহাবী নিজেকে সংযত করতে না পেরে ইহুদীকে ব লেন, সাবধান! নাম ধরে কথা বোলো না। যদি 'রসূলুল্লাহ্ ' বলতে না পারো, তবে অন্তত 'আবুল কাসেম' বলে ডাকো। তখন সেই ইহুদী বলে, আমি তো সেই নামই বলব যা তাঁর মা-বাবা রেখেছে। রসূলু ল্লাহ্ (সা.) মুচকি হেসে সাহাবীদের বলেন, সে ঠিক বলছে। আমার পিতামাতা আমার নাম মুহাম্মদই রেখেছিলেন। যে নামে সে ডাকতে চায় তাকে ডাকতে দাও এবং তার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ কোরো না।

ধৈর্যের এমন সুউচ্চ মান ছিল যে, কখনো কখনো তিনি কোনো কাজের জন্য বাহিরে বের হতেন, তখন কিছু লোক তাঁর পথরোধ করে নিজেদের চাহিদা বর্ণনা করা আরম্ভ করত। সে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের কথা শেষ না করত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি (সা.) দাঁড়িয়ে থাকতেন। এরপর তিনি এগিয়ে যেতেন।

আবার কিছু লোকের অভ্যাস ছিল করমর্দন করলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হাত ধরে রাখত। তিনিও (সা.) তাদের হাত দীর্ঘ সময় ধরে রাখতেন।

যদিও এটি কোনো পছন্দনীয় রীতি নয়, কিন্তু রসূলু ল্লাহ্ (সা.) কখনো নিজের হাত তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতেন না।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৯৪-৩৯৫)

সব ধরনের প্রার্থীরা নিজেদের চাহিদা তাঁর (সা.)-এর কাছে উপস্থাপন করত। কখনো কখনো তিনি (সা.) প্রত্যাশীকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু দিয়ে দিতেন, তখন সে নিজের লোভের বশবর্তী হয়ে আরো বেশি দাবি করত। তিনি (সা.) তাদের সেই প্রত্যাশাও পূরণ করতেন।

কখনো কখনো লোকেরা ক্রমাগতভাবে চাইতে থাকত এবং তিনি প্রত্যেকবার তাদেরকে কিছু না কিছু দিতে দিতেন। এমন পরিস্থিতিতে প্রার্থীদের মাঝে যাদের বিশেষভাবে নিষ্ঠাবান মনে হতো, তাদের চাহিদা অনুযায়ী দিয়ে দেবার পর সেই নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে শুধু এতটুকু বলতেন, যদি তুমি আল্লাহ্ র প্রতি ভরসা রাখতে তাহলে বেশি ভালো হতো।

একবার একজন সাহাবী ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করে কয়েকবার নিজের প্রয়োজনের জন্য অর্থ চাইলেন। তিনি (সা.) তার দাবি পূরণ করলেন ঠিকই, কিন্তু শেষে বললেন, সর্বোত্তম মর্যাদা হলো মানু ষের আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করা। সেই সাহাবীর মাঝে নিষ্ঠা ছিল এবং ভদ্রতাও ছিল; যা কিছু তিনি নিয়েছিলেন ভদ্রতার কারণে সেটি ফেরত দেন নি, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই চাওয়াই আমার শেষ চাওয়া। ভবিষ্যতে আমি আর কারো কাছে কখনো কিছু চাইব না।

এই সাহাবী সম্পর্কে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, একবার যুদ্ধ চলছিল, যুদ্ধের পরিস্থিতি খুবই ভয়ংকর ছিল; যুদ্ধক্ষেত্রে তির বর্ষণ করা হচ্ছিল, তরবারি চলছিল, বর্শা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল; সৈন্যে সৈন্যে যুদ্ধ চলছিল এবং হতাহত হচ্ছিল। ঠিক সে সময় যখন তিনি শত্রুপরিবেষ্টিত ছিলেন, তখন তার হাত থেকে একটি চাবুক পড়ে যায়। তার দলের একজন পদাতিক মুসলমান সৈনিক মনে করেন, অফিসার নীচে

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

নামলে আবার ক্ষতি না হয়ে যায়– একথা ভেবে ঝুঁকে চাবুক তুলতে চাইলেন যেন তার হাতে তা তুলে দিতে পারেন। সেই সাহাবীর দৃষ্টি সেই সৈনিকের ওপর পড়ে এবং তিনি বলেন, হে আমার ভাই! আল্লাহ্ র দোহাই, তুমি চাবুকটি স্পর্শ কোরো না! একথা বলে তিনি ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামেন এবং চাবুক তুলে নেন। এরপর তিনি নিজ সাথিকে বলেন, আমি রসূলু ল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম, আমি কখনো কারো কাছে কিছু চাইব না। যদি আমি তোমাকে চাবুক তুলতে দিতাম, তাহলে মুখে তোমার কাছে কিছু না চাইলেও এতে সন্দেহের কি কোনো অবকাশ রয়েছে যে, কার্যত এটি চাওয়াই গণ্য হতো? আর এমনটি করা আমাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী বানিয়ে দিত। যদিও এটি যুদ্ধক্ষেত্র, কিন্তু আমি নিজের কাজ নিজেই করব। এমন ভয়ানক পরিস্থিতিতেও নিজের অঙ্গীকারের কথা তার স্মরণ ছিল। (দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড–২০, পৃ: ৩৯৫–৩৯৬)

সুতরাং এটি এবং এটি ছাড়াও মহানবী (সা.)–এর জীবনচরিতের আরো অনেক বিষয় রয়েছে– ন্যায়বিচারের ব্যাপারে, আবেগ–অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে, দরিদ্রদের দেখাশোনা করার ব্যাপারে– যেগুলো আমাদের জন্য আদর্শ । দরিদ্রদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে, নারীদের সাথে উত্তম আচরণের বিষয়ে; যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, বাড়িতে স্ত্রীদের সাথে এবং সাধারণ নারীদের সাথেও তিনি (সা.) উত্তম ব্যবহার করতেন; মানবজাতির সেবার ব্যাপারে, প্রতিবেশী এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহারের ব্যাপারে অসংখ্য বিষয় রয়েছে যা মহানবী (সা.)–এর জীবনীতে আমরা দেখতে পাই। মানুষের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি (সা.) কতটা সচেষ্ট থাকতেন, অন্যের দোষত্রুটি গোপন রাখার স্বার্থে তিনি কীভাবে চেষ্টাপ্রচেষ্টা করতেন,পারস্পরিক সাহায্য–সহযোগিতার বিষয়ে তিনি কী বলতেন আর তাঁর (সা.) ব্যবহারিক আচরণ কেমন ছিল, তিনি (সা.) কীভাবে (অন্যের) ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করতেন, কীভাবে ভুলত্রুটি ঢেকে রাখতেন, সত্য বলার বিষয়ে কী কী উপদেশ প্রদান করতেন, কুধারণা করা থেকে আত্মরক্ষার বিষয়ে তিনি কী বলেছেন, গোয়েন্দাগিরি করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে তিনি কী বলেছেন, হতাশা থেকে মুক্ত থাকার বিষয়ে কী বলেছেন, এমনকি জীবজন্তুর সাথেও উত্তম আচরণ করতে বলেছেন এবং পারস্পরিক ধর্মীয় সহনশীলতা সম্পর্কেও তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। এই সবগুলো বিষয় এমন যা আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ অনুকরণীয় আদর্শ। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, ভবিষ্যতে এ বিষয়গুলো আমি সময়–সুযোগ মতো বর্ণনা করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ্ । এখন এ বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত করছি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করছি। তিনি (আ.) বলেন,

"সেই মানব যিনি নিজ সত্তা ও গুণাবলি, নিজ কর্ম ও আদর্শের মাধ্যমে এবং প্রবল বেগে ধাবমান নদীর ন্যায় স্বীয় আধ্যাত্মিক ও পবিত্র শক্তির মাধ্যমে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে এবংসততা ও অবিচলতার সাথে পরিপূর্ণতার পরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং 'পরিপূর্ণ মানব' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন, সেই কল্যাণমন্ডিত নবী হলেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুল আসফিয়া (পবিত্রদের নেতা), রসূলগণের মোহর ও গৌরব জনাব হযরত মুহাম্মদ (সা.)। হে খোদা, হে প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর প্রতি সেই আশিস ও দরূদ বর্ষণ করো যা তুমি সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত কারো প্রতি বর্ষণ করো নি।"

(ইতমামে হুজ্জাত, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩০৮)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামর্থ্য দান করুন, আমরা যেন তাঁর (সা.) জীবনাদর্শঅনুসরণ করার মাধ্যমে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য সচেষ্ট হই আর তাঁর (সা.) এই বাণীকে পৃথিবীময় প্রচারে সচেষ্ট হই , যেন পৃথিবীকেও তাঁর (সা.)–পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

নামাযের পর আমি জানাযার নামাযও পড়াবো।

[জানাযা এসেছে কি?] এরপর বলেন: একটি হবে হাযের জানাযা। এটি জনাব লাইক আহমদ তাহের সাহেবের জানাযা, যিনি যুক্তরাজ্যের মুরব্বী সিলসিলা ছিলেন। সম্প্রতি তিরাশি বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি এক কন্যা ও তিন পুত্র রেখে গেছেন।

লাইক তাহের সাহেব কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর একজন সাহাবীহযরত শেখ ফযল আহমদ বাটালভী সাহেবের (রা.) ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। মেট্রিক পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের পর লাইক সাহেব ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে জীবন উৎসর্গ করেন ও জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে ভর্তি হন। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে জামেয়া পাঠ সমাপ্ত করেন এবং জামেয়ায় অধ্যয়নকালেই তিনি এফ.এ পাশ করেন এবং আরবীতে 'আদীব ফাযেল' ডিগ্রি অর্জন করেন। জামেয়া থেকে পাশ করার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ ডিগ্রিও লাভ করেন। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাকে মুবাল্লেগ হিসেবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয় এবং লন্ডনে অবস্থিত এখানকার ফযল মসজিদের নায়েব ইমাম হিসেবে তার সেবা প্রদানের সৌভাগ্য হয়। অতঃপর ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান ফেরত যান। তিনি ইসলাহ ও ইরশাদ দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থানে মুরব্বী হিসেবে সেবা প্রদান করতে থাকেন। অতঃপর ওয়াকালতে তাসনীফ–এ (পুস্তক রচনা ও প্রণয়ন দপ্তরে) তার বদলি হয়। তিনি মওলানা আব্দুল হামিদ নূরুল হক সাহেবের জামাতা ছিলেন। এরপরসেখানে তার সেবা প্রদানকালীন সময়ে তাকে জামেয়াতে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। আর প্রায় দশ বছর তিনি শিক্ষকতার দায়িত্বও পালন করেছেন। অতঃপর ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে তাকে ওয়াকালতে তবশীরে নিয়োজিত করা হয়, নায়েব ওয়াকিলুত তবশীর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে জামেয়ায় থাকাকালে তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়া ও অঙ্গসংগঠনসমূহেও সেবা প্রদান করেছেন; জামেয়ায় থাকাকালীন সময়েও এবং তার পাকিস্তানে মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে সেবা প্রদানকালেও। ১৯৮৬ সালে তাকে মুবাল্লেগ সিলসিলা হিসেবে আমেরিকায় প্রেরণ করা হয়। এরপর ১৯৮৬ সালেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে এখানে ডেকে এনে গ্লাসগোতে পোস্টিং দেন; সেখানে তিনি মুরব্বী সিলসিলা ও মুবাল্লিগ সিলসিলা হিসেবে সেবা করার সুযোগ পান। ২০০৫ সালে জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের সূচনাতে তাকে জামেয়ার অধ্যক্ষ হিসেবেও নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি প্রায় ৫৯ বছর জামা'তের সেবা করেছেন।

লন্ডনের ফযল মসজিদের ইমাম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব বলেন, মরহুম ইসলামধর্মের প্রতি উৎসর্গিত ও খিলাফতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এক সেবক, জীবনোৎসর্গকারীর দায়িত্ব উত্তমরূপে পালনকারী একজন সফল মু বাল্লেগ সিলসিলা ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে ধর্মের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। অত্যন্ত সুললিত ও আবেগসঞ্চারী কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে তরবিয়তমূলক বিষয়াদিতে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। যেসব জামা'তে তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন সেখানে অসংখ্য পুণ্যের স্মৃতি রেখে গেছেন। জামা'তের সদস্যদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং জনপ্রিয় একজন ধর্মসেবক ছিলেন। লেখালেখির ক্ষেত্রেও তিনি বিভিন্ন সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। দোয়ার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তিনি তার ঘরের দেয়ালগুলো বিভিন্ন দোয়ামূলক বাক্য দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছিলেন। অসংখ্য গুণাবলির অধিকারী ছিলেন।

মুবারক সিদ্দিকী সাহেব বলেন, আমি তাকে রাবওয়ার যুগ থেকেই চিনি। অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির, হাস্যোজ্জ্বল, ভদ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খিলাফত ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রাখতেন। তার সাথে সাক্ষাৎকারীদেরকে খিলাফতের পূর্ণ আনুগত্য করার উপদেশদিতেন। তিনি আরো বলেন, তার পকেটে সর্বদা একটি ছোটো নোটবুক থাকত; যেখানেই কোনো ভালো কথা শুনতেন বা দেখতেন– তৎক্ষণাৎ তা নোট করে নিতেন। বিশেষ কোনো ব্যক্তির কথা হতে হবে এমন নয়; বরং যেখানেই কোনো ভালো কথা শুনতেন, তা তৎক্ষণাৎনোট করে নিতেন। ছাত্রজীবন থেকেই জামা'তের বুযুর্গদের সাহচর্যে বসা তার অভ্যাস ছিল। হাফেয মুখতার আহমদ শাহজাহানপুরী সাহেবের (রা.) অনেক কথা তার স্মরণ ছিল, নিজপরিচিত মহলে মাঝে মাঝে সেগুলো শোনাতেনও।

তার কন্যা কুররাতুল আইন বলেন, আমার পিতার মাঝে আমি বিশেষভাবে যেসব বিষয় লক্ষ করেছি তার মাঝে অন্যতম ছিল তার দোয়া করার ধরন। তার দোয়ায় ব্যাকুলতা, বিনয়, আল্লাহ্র ওপর ভরসা ও আল্লাহ্ তা'লার সমীপে আবদারের সাথে যাচনা করার অদ্ভুত ধরন ছিল। কখনো মনে হতো, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনো উত্তর না পাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করা থামাবেন না। আর তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার আচরণও এমন অদ্ভুত ছিল যে, বিভিন্ন সময় সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে অনেক বিষয়ে পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে জানিয়ে দিতেন। তিনি বলেন, তিনি দোয়ার বিষয়ে আমাদেরকে নসীহত করতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, দোয়াকারীর অবস্থা এমন হওয়া উচিত– 'জো মাঙ্গো সো মর রেহে, মরে সো মাঙ্গান জা'। এটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়; যাচনাকারীর অবস্থা মৃতবৎ হওয়া উচিত, আর যখন এমন অবস্থায় প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহ্ তা'লা শুনবেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন। আজ জুমুআর পর বাইরে গিয়ে আমি তার হাযির জানাযা পড়াবো।

দ্বিতীয়টি গায়েবানা জানাযা; এই স্মৃতিচারণ মোকাররম সেগা জালু সাহেবের, যিনি মালির সিগো অঞ্চলের নায়েব আমীর ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনিও মূসী ছিলেন। মু বাল্লেগ

(এরপর ১১ পাতায়....)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

সফর বৃত্তান্ত

নও মোবাইয়ানদের অনুভূতি

আজ আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে ৬৭ জন ব্যক্তি হযরত আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ-এর মুবারক হস্তে বাইয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এই নববাইয়াতদের সম্পর্ক ছিল ষোলোটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সঙ্গে। বাইয়াতের এই সৌভাগ্য লাভকারী বন্ধুদের আনন্দ ছিল ভাষায় প্রকাশের অতীত। তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজন নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

সানি বাওয়া, যিনি বেলজিয়ামে বসবাসকারী নাইজারের অধিবাসী, প্রথমবারের মতো জার্মানির জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, এত বৃহৎ একটি জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত এবং দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর ইচ্ছা ছিল খলিফাতুল মসীহকে স্বচক্ষে দেখার। জলসায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জলসায় আসার আগে বাইয়াত করার কথা তাঁর মনে আসেনি। কিন্তু এখানে এসে তিনি যখন দেখলেন, মানুষদের মধ্যে নিজেদের খলিফাকে দেখার কত গভীর আকুলতা এবং তাঁর প্রতি হৃদয়ের কত গভীর ভালোবাসা রয়েছে, তখন তা তাঁর হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। ফলে তিনি এই জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং রবিবার হযরত আনওয়ারের হাতে বাইয়াত করেন।

আবু জায়দি হুসাইন, যিনি নাইজারের অধিবাসী এবং ধর্মীয়ভাবে মুসলমান, বেলজিয়াম থেকে জলসা সালানা জার্মানিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, জালসায় আসার পূর্বে তিনি আহমদি ছিলেন না, কিন্তু জলসা তাঁর জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দিয়েছে। এখন তিনি বিশ্বাস করেন যে সকলেরই এই জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, কারণ এই জামাতই সেই প্রকৃত ইসলামের অনুসারী, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের দিয়েছেন।

তিনি বলেন, জার্মানির জলসায় অংশগ্রহণ করা তাঁর জন্য এক বিরাট সম্মানের বিষয় এবং তিনি এটিকে নিজের বড় সৌভাগ্য মনে করেন। বাইয়াতের মাধ্যমে জামাতে আহমদিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে তিনি গর্ব অনুভব করেন। অতএব, তিনিও রবিবার অনুষ্ঠিত বাইয়াত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে জামাতে অন্তর্ভুক্ত হন।

জাকারিয়ায়ে সেবাই, মরক্কোর অধিবাসী, এ বছরও জলসা সালানা জার্মানিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, মরক্কোতে থাকার সময় তিনি কখনো আহমদিয়াত সম্পর্কে শোনেননি। কিন্তু বেলজিয়ামে আসার পর তাঁর এক মরক্কান বন্ধু মুহাম্মদ উশ সাহেব কুরআন ও হাদিসের আলোকে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার পক্ষে বহু যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ওফাত সংক্রান্ত বিষয়টিও তাঁর কাছে স্পষ্ট করে দেন, যার পর তাঁর মনে আর কোনো সন্দেহ অবশিষ্ট থাকেনি।

তিনি আরও বলেন, কিছুদিন পর ব্রাসেলস মিশন হাউসে তাঁর মুনীর উদা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং সেখানে আহমদিয়াত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। গভীর চিন্তা-ভাবনার পর তিনি প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করেন। এরপর তিনি জালসায় অংশগ্রহণ করেন এবং হযরত আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ-এর হাতে সরাসরি বাইয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

সালেহ ইয়াহইয়া, বেলজিয়ামে বসবাসকারী নাইজারের এক বন্ধু এবং ধর্মীয়ভাবে মুসলমান, তিনিও জালসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, তিনি একজন মুসলমান এবং কুরআন কারিম অধ্যয়ন করেছেন। গভীর চিন্তা-ভাবনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আহমদিয়া মুসলিম জামাতই প্রকৃত ইসলাম।

তিনি বলেন, আফ্রিকায় তিনি বহু আলেমের বক্তৃতা শুনেছেন, কিন্তু হযরত আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ-এর বক্তৃতা শুনে যে প্রভাব ও উপকার তিনি পেয়েছেন, তা এর আগে কখনো পাননি। জামাতকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি এই জালসাতেই আহমদিয়াতে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং রবিবার বাইয়াত করেন।

জামাউই তাওফিক, মরক্কোর অধিবাসী, জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, তিনি অন্যান্য প্রচলিত মুসলিমদের লেখা তাফসিরও পড়েছেন এবং জামাতে আহমদিয়ার লেখা তাফসিরও অধ্যয়ন করেছেন; কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে প্রকৃত ও মৌলিক তাফসির হলো সেগুলো, যা হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এবং খোলাফায়ে আহমদিয়াত রচনা করেছেন।

তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর ওফাত, জিনের বিষয়, ঈসা (আ.)-এর নুযুল ও ইমাম মাহদির বিষয়-এসব সমস্যার সমাধান তিনি কেবল জামাতে আহমদিয়ার তাফসিরেই পেয়েছেন এবং সেগুলোকে তিনি জ্ঞানগত ও যুক্তিগত দিক থেকে পরিপূর্ণ মনে করেছেন। তিনি এ বিষয়ে ১৭ বছর গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করেছেন। পূর্ণ সন্তুষ্টি লাভের পর তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে আহমদিয়াতের সত্যতা সম্পর্কে বহু রুয়া প্রদর্শন করেন।

তিনি এমটিএ আল-আরাবিয়া ও এর টিমের প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, কারণ তাঁদের মাধ্যমে তিনি জ্ঞানগত দিক থেকে পূর্ণ দিকনির্দেশনা পেয়েছেন। অবশেষে তিনি বাইয়াত করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরাও বাইয়াত করেছেন। তিনি সাক্ষ্য দেন যে এই জামাতই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহর অনুগ্রহে এই জামাতই প্রকৃত জিহাদ পরিচালনা করছে।

আইয়ুব সালেহ, নাইজারের অধিবাসী এবং ধর্মীয়ভাবে মুসলমান, বেলজিয়াম থেকে জালসা সালানা জার্মানিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, ইতালিতে থাকার সময় তিনি সর্বদা দোয়া করতেন যেন আল্লাহ তাআলা তাঁকে সরল পথে অবিচল রাখেন এবং তিনি ইসলামের ওপর অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আমল করতেন, অবশেষে আল্লাহ তাঁকে বেলজিয়ামে নিয়ে আসেন।

তিনি এমটিএ-তে হযরত আনওয়ারকে দেখেছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে তখন কোনো গবেষণা করেননি। বেলজিয়ামে আসার তিন মাস পর তাঁর সঙ্গে সেখানকার সেক্রেটারি তাবলীগের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি জামাত সম্পর্কে অবহিত হন। তাঁকে ব্রাসেলসের মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অন্যান্য আহমদিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, সেখানেই তিনি নামাজ ও ইসলামের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে জামাতের প্রতি তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি যখন তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আহমদিয়াত বিষয়ে কথা বলেন, তখন তাঁরা বিরোধিতা করে বলেন কেন তিনি তাঁর ধর্ম পরিবর্তন করতে চান। তিনি তাঁদের জবাবে বলেন, কীভাবে তাঁরা এমন ধারণা করতে পারেন যে তিনি কোনো ভুল পথ গ্রহণ করবেন।

তিনি আরও বলেন, জামাতের শিশু ও খুদ্দামের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি গভীর প্রশান্তি লাভ করেন এবং তাঁদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত আত্মা প্রত্যক্ষ করেন। বাইয়াতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তিনি নাইজারের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গেও জামাত সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাঁদের জামাতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে তাঁরা সবাই তাঁর সঙ্গে একমত হন এবং এ বছর জার্মানির জালসায় অংশগ্রহণের জন্য তাঁর সঙ্গে আসেন।

নাইজার থেকে আগতদের সংখ্যা ছিল ১৪ জন। জালসার পরিবেশ দেখে তাঁরা সবাই বাইয়াত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং রবিবার আহমদিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হন।

মুতারি উমর, নাইজারের অধিবাসী এবং ধর্মীয়ভাবে মুসলমান, বলেন যে তিনি প্রায়ই হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতেন। তাঁর যুক্তি ছিল, যদি কোনো নবীকে জীবিত রাখা হতো, তবে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সে যোগ্য ছিলেন, যিনি সকল নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হযরত ঈসা (আ.) নন।

তিনি বলেন, আফ্রিকায় তাঁদের শেখানো হতো যে হযরত ঈসা (আ.) আসমানে জীবিত আছেন এবং তিনি আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু বেলজিয়ামে এসে সেখানকার সেক্রেটারি তাবলীগের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হযরত ঈসা (আ.)-এর হায়াত সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার পর আল্লাহর অনুগ্রহে বিষয়টি দ্রুত তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

তিনি বলেন, বিশ্বে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন এবং সবসময় ভাবতেন ইসলাম কীভাবে উন্নতি লাভ করবে। জামাতের সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি দ্রুতই খিলাফত ও এর বরকত সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হন। এক ইমাম ও এক খলিফা বিশিষ্ট এই জামাত পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন, কারণ ইসলামের উন্নতি তখনই হয়েছিল, যখন খিলাফত বিদ্যমান ছিল।

তিনি আরও বলেন, জামাতের যে বিষয়টি তাঁর সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হলো-জামাত যখনই কোনো বিষয় উপস্থাপন করে, তখনই কুরআন ও হাদিস থেকে তার সমর্থনে দলিল প্রদান করে। জালসার শেষ দিনে তিনিও বাইয়াত করে আহমদিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হন।

লোগো পিয়েরঘো, বেলজিয়ামের একজন স্থানীয় বাসিন্দা, তিনিও জার্মানির জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, জামাতে আহমদিয়ার পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, সৌহার্দ্য এবং মানবতার সেবায় তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি আগে থেকেই হিউম্যানিটি ফার্স্ট সম্পর্কে জানতেন এবং দুই বছর ধরে জামাতের শিক্ষার ওপর গবেষণা করছিলেন।

তিনি বলেন, তিনি ইতোমধ্যেই মুসলমান ছিলেন, যদিও বিষয়টি কেউ জানত না। একদিন তিনি স্বপ্নে আজানের ধ্বনি শুনেন এবং অনুভব করেন যে তাঁকে নামাজের দিকে, অর্থাৎ ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো হচ্ছে। আজ যখন তিনি হযরত আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ-এর অতিথিদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ শুনলেন, তা তাঁর অন্তরে গভীর পরিবর্তন এনে দেয় এবং তিনি বাইয়াতের মাধ্যমে আহমদিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

অতএব, তিনি রবিবার বাইয়াত করেন। খলিফাতুল মসীহের দর্শন লাভের সময় তিনি অনুভব করেন, যেন কোনো নূর তাঁকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিয়েছে।

আহ! আমার স্নেহশীল দরবেশ পিতা শ্রদ্ধেয় গিয়ানি আবদুল লতিফ সাহেব, দরবেশ-মরহুম, কাদিয়ান দারুল আমান।

-শামিম আখতার গিয়ানি, সাবেক সদর লাজনা, ভারত

আমার মরহুম পিতার সম্মানিত নাম ছিল শ্রদ্ধেয় গিয়ানি আব্দুল লতিফ সাহেব দরবেশ। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের কপুরথালা নিবাসী শ্রদ্ধেয় মাওলভি আব্দুল রহমান সাহেবের পুত্র এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর সাহাবি শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলভি মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব কপুরথালভি (রা.)-এর নাতি। হযরত মাওলভি মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব কপুরথালভি (রা.)-এর সম্মানিত নাম সেই ৩১৩ জন সাহাবির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের নাম স্বয়ং হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আঞ্জামে আথাম-এ লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমার মরহুম পিতার পৈতৃক গ্রাম ছিল পারমজিতপুর, যা আলুপুর নামেও পরিচিত-তৎকালীন কপুরথালা রাজ্যের সুলতানপুর লোধি তহসিলের প্রায় ১৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। তিনি ১৯২৭ সালে আলুপুর গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তাঁর এক ভাই-সবার ছোট-শ্রদ্ধেয় আব্দুল মান্নান সাহেব আল্লাহর কৃপায় জীবিত আছেন এবং পুত্র শ্রদ্ধেয় আদনান আহমদ সাহেবসহ যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন।

আমার সম্মানিত পিতা কাদিয়ানের তালিমুল ইসলাম স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি এবং নিজ গ্রাম আলুপুরে ফিরে যান। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তাঁকে সেনাবাহিনীতে নার্সিং সোলজার (কম্পাউন্ডার) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি পাঁচ বছর সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধ শেষে অব্যাহতি পেয়ে গ্রামে ফিরে আসেন। কিছুদিন পর জলন্ধরের সিভিল হাসপাতাল থেকে একটি চিঠি আসে-যেখানে জানানো হয় যে সরকার তাঁকে চাকরি দিতে ইচ্ছুক।

ঠিক সেই সময় আল-ফজল পত্রিকায় একটি ঘোষণা প্রকাশিত হয় যে হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রা.) কাদিয়ানে একটি গ্রামীণ মিশনারি ক্লাস শুরু করেছেন এবং অবসরপ্রাপ্ত ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত সৈনিকরাও এতে ভর্তি হতে পারবেন। এই ঘোষণা পড়ে আমার মরহুম পিতা তাঁর পিতার (আমার দাদার) সঙ্গে পরামর্শ করেন-তিনি কাদিয়ানে যাবেন, না কি জলন্ধরে। আমার দাদা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন যে কাদিয়ানের দিকে মুখ ফেরানো তাঁর জন্য বিরাট বরকতের কারণ হবে। সেই মুহূর্ত থেকেই এক ঐশী পরিকল্পনার সূচনা হয়, যার মাধ্যমে আমার দরবেশ পিতাকে ত্যাগের জীবন লাভের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল।

আমার পিতা দরবেশির পোশাক ও জীবনকে আল্লাহ তাআলার এক মহান অনুগ্রহ ও নিয়ামত বলে মনে করতেন এবং প্রায়ই প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর এই যুগলপদ গভীর আনন্দের সঙ্গে পাঠ করতেন-

"এ তো কেবল তোমারই কৃপা ও অনুগ্রহ যে তুমি আমাকে বেছে নিয়েছ; নচেৎ তোমার দরবারে তো খাদেমের কোনো অভাব ছিল না।"

এরপর কাদিয়ানে তাঁর দরবেশি জীবনে একের পর এক পরীক্ষা ও কষ্টের অধ্যায় শুরু হয়-যার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। তবুও আল্লাহর সাহায্য কামনা করে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করছি। আমার মরহুম পিতার দরবেশি জীবন ছিল পরীক্ষায় পরিপূর্ণ এক উন্মুক্ত অধ্যায়।

তিনি ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে জম্মু ও কাশ্মীরের ভাদেরওয়াহে মরহুম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেব মান্ডাশির জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রদ্ধেয় সামিনা বেগম সাহেবার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ধন-সম্পদ, জীবন, সন্তান এবং পার্থিব সব বিষয়ে পরীক্ষা করেছেন; কিন্তু কখনোই তাঁর পদচ্যুতি ঘটেনি। তিনি প্রতিটি কষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে সহ্য করেছেন এবং আল্লাহর ফয়সালায় সর্বদা সন্তুষ্ট থেকেছেন। তাঁর দুইজন প্রতিবন্ধী পুত্র প্রায় ২৫ ও ২৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং আরও তিনজন পুত্র শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। এত বড় বিপর্যয়ের মাঝেও তিনি ধৈর্য ও হাসিমুখে সবকিছু সহ্য করেছেন, কখনো অভিযোগ করেননি এবং দুঃখ-সুখ সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থেকেছেন।

দরবেশি জীবনে জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি প্রায় সব ধরনের কাজই করেছেন-দৈনিক মজুরি, গ্রামে গ্রামে কাপড়ের টুকরা বিক্রি, সবজি ও কাঠের আড়তে কাজ, পোলট্রি ফিড ও মুদি দোকান, চায়ের দোকান, সাইকেলে করে গ্রামে গ্রামে ডিম সরবরাহ, মহিষ পালন ও পোলট্রি পালন ইত্যাদি। দরবেশি জীবন চালাতে তিনি এমন কোনো কাজ বাকি রাখেননি যা করেননি।

এরপর আসে জামাআতের খিদমতের অধ্যায়। দ্বীনের খিদমত তো আল্লাহরই অনুগ্রহ-"এ আল্লাহর ফজল; তিনি যাকে চান দান করেন।" আমার পিতা প্রায়ই বিনয়ভরে দোয়া করতেন-

"হে দয়ালু প্রভু! তোমার কুদরতের বিস্ময় আমাকে অবাক করে কোন কাজের বদলে তুমি আমাকে এই নৈকট্য ও খিদমতের পোশাক দান করলে?

প্রাথমিক সময়ে তিনি কাদিয়ানের বাইরে তবলীগি কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীতে সদর আঞ্জুমান আহমদিয়া কাদিয়ানের বিভিন্ন দপ্তরে খিদমতের সুযোগ পান-নজারত উমূর-এ-আম্মা, নজারত বায়তুল মাল, নজারত তালীম, নজারত নাশর ও ইশাআত, স্থানীয় আমীরের দপ্তর এবং অতিথি দপ্তর-আলহামদুলিল্লাহ। কিছু সময় তিনি পত্রিকা বদর-এর ম্যানেজার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সাত-আট বছর সাহিত্য শাখার ইনচার্জ ছিলেন। মরহুম গিয়ানি ইবাদুল্লাহ সাহেব কর্তৃক অনূদিত কুরআনের গুরমুখী অনুবাদের পুনঃপ্রকাশ ও প্রুফ রিডিংয়ে তিনি অপরিসীম শ্রম দেন। আল্লাহর কৃপায় আমি নিজেও গিয়ানি পাঞ্জাবি শিক্ষক হিসেবে এই কাজে তাঁকে সহায়তা করি এবং এজন্য তাঁকে দীর্ঘ সময় অমৃতসর ও জলন্ধরের প্রেসে অবস্থান করতে হয়।

১৯৮৯ সালের জামাআতের শতবর্ষ জুবিলির পূর্বে তিনি কুরআনের নির্বাচিত আয়াত, নির্বাচিত হাদিস এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর নির্বাচিত রচনার গুরমুখী অনুবাদ প্রস্তুত করেন। পুত্তর জীবনী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গুরমুখী সংস্করণের সংশোধন, প্রুফরিডিং ও মুদ্রণেও তিনি কাজ করেন। তাঁর ইচ্ছায় আমি গিয়ানি (অনার্স) ডিগ্রি অর্জন করি, যাতে তাঁর কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করতে পারি-আলহামদুলিল্লাহ। ১৯৮৮ সালের দিকে তিনি অবসর নেন; পরে পুনরায় নিয়োজিত হয়ে বারো বছর অতিথি দপ্তরের ইনচার্জ হিসেবে শিক্ষা, তরবিয়ত, তবলীগ এবং অমুসলিম দর্শনার্থীদের পবিত্র স্থান পরিদর্শনে দিকনির্দেশনার কাজ করেন।

তাঁর তবলীগের আগ্রহ ছিল অসাধারণ। দর্শনার্থীরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁদের বিদায় দিতেন না। তরুণ-বৃদ্ধ সবাইকে বাড়িতে এনে মায়ের সহযোগিতায় আপ্যায়ন করতেন। পবিত্র স্থানগুলোতে তিনি নিজে সঙ্গে যেতেন; এমনকি দিনে দুই-তিনবার মিনারাতুল মসীহে উঠতেও দ্বিধা করতেন না। আমরা কখনো বললে-"আব্বাজি, এত গরমে ও এই বয়সে বারবার ওঠা আপনার জন্য কষ্টকর-তিনি বলতেন, "আবহাওয়া বা বয়স আমাদের ক্ষতি করতে পারে না। আমরা আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছি এই পবিত্র স্থানগুলোর হিফাজত করব, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তা পালন করব।"

এভাবেই তিনি যৌবনে খলিফা ও জামাআতের কাছে করা অঙ্গীকার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পালন করেছেন। আল্লাহ তাআলা এমন সব দরবেশের ত্যাগ কবুল করুন এবং তাঁদের জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মর্যাদা দান করুন-আমিন।

তিনি বাহিশতি মাকবারার কিছু প্লট পরিষ্কারের দায়িত্বও পালন করতেন এবং প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার আগে নিয়মিত সেগুলো পরিষ্কার করতেন।

আমার দরবেশ পিতা ছিলেন ইসলামী মূল্যবোধে কঠোর, খিলাফতের প্রতি গভীরভাবে অনুগত, জামাআতের ব্যবস্থার এক অনুগত সৈনিক, অত্যন্ত বিনয়ী ও হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ। কষ্টের মাঝেও তাঁর মুখে হাসি লেগে থাকত। কাদিয়ান দারুল আমানের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম ভালোবাসা।

তিনি রেখে গেছেন তিন কন্যা-আমি শামীম আখতার গিয়ানি (স্বামী: শ্রদ্ধেয় সৈয়দ সাবাহউদ্দিন সাহেব, ওয়াকফে-জিন্দেগি), শ্রদ্ধেয় শাহীন আখতার সাহেবা (স্বামী: শ্রদ্ধেয় দিলাওয়ার খান সাহেব, ওয়াকফে-জিন্দেগি) এবং শ্রদ্ধেয় ইয়াসমিন আখতার সাহেবা (স্বামী: শ্রদ্ধেয় নাসির আহমদ আরিফ সাহেব, ওয়াকফে-জিন্দেগি)-এবং দুই পুত্র-শ্রদ্ধেয় আব্দুল হাফিজ সাহেব গিয়ানি ও শ্রদ্ধেয় আব্দুল হাদি সাহেব গিয়ানি। আল্লাহর কৃপায় সবাই সুখে বসবাস করছেন। নাতি-নাতনিদের মধ্যে দশজন ওয়াকফে-নও স্কিমের অন্তর্ভুক্ত। জ্যেষ্ঠ নাতি আজিজ তাহির আহমদ হাফিজ একজন ওয়াকফে-জিন্দেগি মিশনারি-আলহামদুলিল্লাহ। এসব নিয়ামত তাঁকে সর্বদা আনন্দিত করত।

২০০২ সাল থেকে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। পড়ে গিয়ে হিপ বোন ভেঙে দুইবার অস্ত্রোপচার হয়। তবুও তিনি ধৈর্য হারাননি। শেষ তিন-চার মাস তিনি কঠিন খাবার নিতে পারেননি। অবশেষে ২০০৯ সালের ২০ নভেম্বর শুক্রবার রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে তিনি তাঁর প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরে যান-ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরদিন তাঁকে কাদিয়ানের বাহিশতি মাকবারার দরবেশান প্লটে দাফন করা হয়।

আমি পাঠকদের কাছে অনুরোধ করছি-আমার পিতার মাগফিরাত ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং আমাদেরকে তাঁর গুণাবলি ও ত্যাগ বহন করার তাওফিক দানের জন্য দোয়া করবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই দোয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" **(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)**

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

সীরাত খাতামান্নবীঈন

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ

আরবের দেশ ও তার অধিবাসীরা

ভৌগোলিক বিভাজন

ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরব দেশটি কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত। এর প্রধান অঞ্চলগুলো নিম্নরূপ–

(১) পশ্চিম দিকে রয়েছে হিজাজ, যা লোহিত সাগরের তট বরাবর ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চলকে বোঝায়। মক্কা, তায়েফ, মদিনা ও জেদ্দার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো এই অঞ্চলে অবস্থিত। ইসলামের আবির্ভাবকালে আরব মুস্তারিবা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বনু কিনানা, হুযাইল, হাওয়াযিন এবং বনু কাহতানের কিছু শাখা–যেমন আজদ–এই এলাকায় বসবাস করত।

হিজাজের দক্ষিণে এবং কারও মতে এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই তিহামা নামে আরেকটি প্রসিদ্ধ অঞ্চল অবস্থিত, যা লোহিত সাগরের উপকূল বরাবর বিস্তৃত।

(২) আরবের দক্ষিণ–পশ্চিমে রয়েছে ইয়েমেন, যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও বিশেষভাবে উর্বর একটি অঞ্চল। প্রাচীনকালে এটি একটি শক্তিশালী ও সভ্য রাষ্ট্রের কেন্দ্র ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এটি হাবশার অধীন ছিল এবং ইসলামের আবির্ভাবকালে পারস্যের অধীনস্থ ছিল। এর প্রধান শহর সানআ এক সময় খুবই প্রসিদ্ধ ছিল এবং ইয়েমেন রাজ্যের রাজধানী ছিল। পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত সাবা জাতি এক সময় এই অঞ্চলেই বসবাস করত। ইয়েমেনই ছিল বনু কাহতান–এর জন্মভূমি ও আদি নিবাস। এখান থেকেই বহু কাহতানি গোত্র আরবের উত্তর দিকে হিজরত করেছিল। সে অনুযায়ী মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্র–যারা পরে ইসলামে আনসার নামে পরিচিত হয়–এই অঞ্চল থেকেই আগমন করেছিল।

ইয়েমেনের সংলগ্ন উত্তর–পূর্ব দিকে অবস্থিত আরেকটি অঞ্চল হলো নাজরান। ইসলামের আবির্ভাবকালে এটি আরব খ্রিস্টানদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পবিত্র কুরআনেও উল্লিখিত মুবাহালার ঘটনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অঞ্চলের লোকদেরই আহ্বান করেছিলেন।

(৩) আরবের দক্ষিণে, ইয়েমেনের পূর্বদিকে রয়েছে হাদরামাউত, এবং হাদরামাউতের পূর্বদিকে মাহরাহ অবস্থিত। উভয়ই সুপরিচিত অঞ্চল।

(৪) আরবের দক্ষিণ–পূর্বে রয়েছে ওমান, যার রাজধানী মাস্কাট একটি প্রসিদ্ধ শহর।

(৫) পূর্ব দিকে, পারস্য উপসাগরের উপকূল বরাবর রয়েছে আল–আহসা অঞ্চল। এর নিকটে রয়েছে বাহরাইন দ্বীপপুঞ্জ। এ কারণেই কখনও কখনও আল–আহসাকেও বাহরাইন বলা হয়। বাহরাইনের উপকূল থেকে মুক্তা আহরণ করা হয়।

(৬) আরবের মধ্যভাগে অবস্থিত নাজদ, যা একটি অত্যন্ত বিস্তৃত ও প্রসিদ্ধ অঞ্চল। এটি কয়েকটি ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত, যাদের কিছু আরবের উর্বর অংশ হিসেবে গণ্য হয়। গাতাফান ও সুলাইম প্রভৃতি গোত্র এখানে বসবাস করত। নাজদের দক্ষিণ–পূর্বে অবস্থিত ইয়ামামা ছিল বনু হানিফা গোত্রের নিবাস, যাদের মধ্যেই মুসাইলিমা কাজ্জাব জন্মগ্রহণ করেছিল।

(৭) ইয়ামামা ও হাদরামাউতের মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম আল–আহকাফ। এটি একটি পরিচিত অঞ্চল ছিল এবং এখানেই আদ জাতির বসবাস ছিল, যাদের নিকট নবী হুদ (আলাইহিস সালাম) প্রেরিত হয়েছিলেন। বর্তমানে এ অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য ও পরিত্যক্ত।

(৮) নাজদের উত্তর–পূর্বে, হিজাজের সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে খাইবার, যা প্রাচীনকালে ইহুদিদের একটি বড় কেন্দ্র ছিল এবং দুর্গ দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত ছিল। খাইবারের উত্তর–পূর্বে তাইমা ছিল আরেকটি ইহুদি কেন্দ্র। তাইমার নিকটেই রয়েছে হিজর জনপদ, যেখানে সামূদ জাতি বসবাস করত–যাদের নিকট নবী সালেহ (আলাইহিস সালাম) প্রেরিত হয়েছিলেন। হিজরের পশ্চিম দিকে, সমুদ্র উপকূলের দিকে রয়েছে মাদইয়ান অঞ্চল, যেখানে নবী মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর নবুয়ত লাভের পূর্বে নবী শু'আইব (আলাইহিস সালাম)–এর নিকট এসে অবস্থান করেছিলেন।

অধিবাসীরা

আরব দেশটি জনসংখ্যার দিক থেকে খুবই কম বসতিপূর্ণ। স্বল্প বৃষ্টিপাত, বিস্তীর্ণ মরুভূমি, উদ্ভিদ ও খনিজ সম্পদের অভাব–এ ধরনের বহু কারণ একত্রে এর জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তবুও আধুনিক কালে এর জনসংখ্যা প্রায় সত্তর থেকে আশি লক্ষ বলে অনুমান করা হয়, যা দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার তুলনায় মোটেই কম নয়।

জাতিগত বিভাজনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসবিদরা আরব গোত্রগুলোকে এক হিসেবে দুই ভাগে এবং অন্য হিসেবে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন।

প্রথম: আরব 'আরিবাহ (খাঁটি আরব)

অর্থাৎ দেশের প্রাচীন ও আদি অধিবাসীরা। এরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত–

(ক) আরবের সেই প্রাচীনতম অধিবাসীরা, যারা ইসলামের বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের বিস্তারিত অবস্থা আমাদের জানা নেই। তবে এটুকু জানা যায় যে তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল, দেশের নানা অঞ্চলে বসবাস করত এবং তাদের মধ্য থেকে কিছু গোত্র শক্তিশালী ও সভ্য রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা করেছিল। আদ, সামূদ, তাসম, জাদিস এবং প্রাচীন জুরহুম–এগুলো তাদের মধ্যকার কয়েকটি প্রসিদ্ধ গোত্রের নাম। আদ জাতির নিবাস ছিল আল–আহকাফে এবং সামূদ হিজাজের উত্তরে জাওফ অঞ্চলে বসবাস করত। এ প্রাচীনতম গোত্রগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে এদের আরব বায়িদাহ (বিলুপ্ত আরব) বলা হয়।

(খ) যেসব গোত্র বনু কাহতান নামে পরিচিত। কিছু বর্ণনা অনুযায়ী তারা নবী হুদ (আলাইহিস সালাম)–এর বংশধর ছিলেন। যাই হোক, আরব বায়িদাহর পর তারাই দেশে বিস্তার লাভ করে। তাদের আদি নিবাস ছিল ইয়েমেন, সেখান থেকে তারা সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু শাখায় বিভক্ত হয়।

আরবের উত্তরে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের সংলগ্ন এলাকায় যথাক্রমে হিরা ও গাসসান নামে দুটি প্রসিদ্ধ রাষ্ট্র ছিল, যাদের শাসকরাও বনু কাহতানভুক্ত ছিলেন। ইসলামের আবির্ভাবকালে বনু কাহতান ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল এবং দেশে তাদের যথেষ্ট প্রভাব ও শক্তি ছিল। দেশের একটি বড় অংশ তাদের দ্বারা জনবসতিপূর্ণ ছিল। মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রও বনু কাহতানের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন:

আমার অভিমত হল, সুদের অর্থ নিজের জন্য ব্যয় করা সম্পূর্ণরূপে হারাম সেটি ব্যক্তিগত যে কোন প্রয়োজনেই হোক না কেন। নিজ সন্তানদেরকে তা প্রদান করা অথবা ফকির–মিসকিনকে প্রদান করাও হারাম।

(আল হাকাম, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫)

(খুতবার শেষাংশ.....)

সিলসিলা তাসির সাহেব লেখেন, রেডিও প্রোগ্রাম শোনার মাধ্যমে মরহুম ২০১৬ সালে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর তিনি ঈমানের ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি করেছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও সক্রিয় আহমদী ছিলেন। জামা'তী প্রোগ্রামসমূহে এবং আর্থিক কুরবানীতে বেশি বেশি অংশগ্রহণকরতেন। প্রতিদিন অনেক দূর থেকে মসজিদে এসে ফজর, মাগরিব এবং এশার নামায আদায় করতেন। খিলাফতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। ২০১৮ সালে তিনি ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্ত র্ভু ক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন আর মৃত্যু অবধি প্রতি মাসের শুরুতেই নিজ বেতন থেকে ওসিয়্যতের চাঁ াদা আদায় করে দিতেন। একবার তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কোনো কারণে বেতন পান নি, আফ্রিকাতে মাঝে মাঝে এমনটি হয়। চাঁ াদা দিতে না পারায় তিনি অত্যন্ত অস্থির ছিলেন। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন এবং বেতন পাওয়া মাত্রই সর্বপ্রথম তিনি নিজ ওসিয়্যতের চাঁদাসহ বাকি সকল চাঁদা আদায় করে দেন। তার স্ত্রী এবং তিন ছেলে ছিলেন যাদেরকে তিনি তবলীগ করতেন, আর তার তবলীগেই দুই ছেলে আহমদী হয়। কিন্তু তার স্ত্রী ও এক ছেলে আহমদীয়াত গ্রহণ করে নি। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। আহমদীয়াতের ওপর অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অআহমদীদের এবং মোল্লাদের বিষয়ে তার ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল। তিনি বলতেন, এসব লোক মসীহ্ ও মাহদীকে গ্রহণ না করা পর্যন্ত সফল হতে পারে না। অত্যন্ত সক্রিয় তবলীগকারী ছিলেন এবং জামা'তের সেবকও ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন। (আমীন) (আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল,৯ জানুয়ারী, ২০২৬)

❁****❁****❁****❁

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 29 Jan 2026 Issue No.5

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সীরাতুল মাহদী

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ

{১০}পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আমার সম্মানিতা মাতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছিলেন–যখন বড় মির্জা সাহেব (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহের পিতা) কাশ্মীরে কর্মরত ছিলেন, তখন বহুবার এমন হতো যে আমাদের দাদি বলতেন, "আজ আমার মন বলছে কাশ্মীর থেকে কিছু আসবে,"আর ঠিক সেই দিনই কাশ্মীর থেকে একজন লোক এসে উপস্থিত হতো। কখনো কখনো তো এমনও হতো যে, একদিকে দাদি এই কথা বলছেন, আর অন্যদিকে দরজায় কড়া নাড়া পড়ল। খোঁজ নিয়ে জানা যেত যে কাশ্মীর থেকে একজন লোক এসেছে।

আমার মাতা বলতেন যে, তোমাদের দাদা কয়েক মাস পরপর কাশ্মীর থেকে নিজের একজন লোককে চিঠি ও টাকা দিয়ে পাঠাতেন। নগদ অর্থ–রূপা বা সোনার আকারে–একটি মোটা কাঁথা বা গুদরির ভেতরের স্তরে সেলাই করা থাকত, যা সেই লোকটি যাত্রাপথে পরিধান করে রাখত। কাদিয়ানে পৌঁছে সে তা খুলে ঘরের ভেতরে পাঠিয়ে দিত। ঘরের লোকেরা খুলে টাকা বের করে নিত এবং পরে সেই গুদরি ফিরিয়ে দিত।

আমার মাতা আরও বলেন যে, তোমাদের দাদা কাশ্মীরে 'সুবা' (প্রাদেশিক কর্মকর্তা) পদে ছিলেন। এ সময় হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উপরতলা থেকে নেমে এসে বললেন যে, আজকাল যেমন ইংরেজদের মধ্যে ডেপুটি কমিশনার ও কমিশনার থাকে, তেমনই কাশ্মীরে তখন অঞ্চলভিত্তিক গভর্নর বা সুবা থাকত।

এই অধম বর্ণনাকারী নিবেদন করছি যে, আমাদের দাদি–অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহের সম্মানিতা মাতা–এর নাম ছিল চেরাগ বিবি। তিনি দাদার জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত সাহেবকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং হযরত সাহেবও তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। আমি বহুবার দেখেছি, যখনই তিনি তাঁর কথা উল্লেখ করতেন, তখন তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত।

{১১}পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আমার সম্মানিতা মাতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) দিনগুলোর মধ্যে মঙ্গলবারকে ভালো দিন হিসেবে মনে করতেন না। হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আরও বর্ণনা করেছেন যে, যখন মোবারকাহ বেগম (আমাদের বোন) জন্মগ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন দিনটি ছিল মঙ্গলবার। তাই হযরত সাহেব দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ যেন তাঁকে মঙ্গলবারের কষ্টকর প্রভাব থেকে রক্ষা করেন।

এই অধম নিবেদন করছি যে, হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেন। আর এটাও জানা উচিত যে, দিনের হিসাব কেবল পার্থিব মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। বাস্তবিকই, দুনিয়ার জন্য তাঁর ইন্তেকালের দিনটি ছিল এক মহা বিপর্যয়ের দিন।

(এই বর্ণনার অর্থ এই নয় যে মঙ্গলবার কোনো অশুভ দিন। বরং, যেমনটি দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণনা নং ৩১১, ৩২২ ও ৩৬০–এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এর অর্থ কেবল এই যে মঙ্গলবার কিছু গোপন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক প্রভাবের অধীনে কঠোরতা ও কষ্টের একটি দিক বহন করে। সুতরাং মঙ্গলবার সম্পর্কে একটি হাদিসেও আসে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–মঙ্গলবার সেই দিন, যেদিন আল্লাহ তাআলা পাথুরে পাহাড় ও ক্ষতিকর বস্তু সৃষ্টি করেছেন। দেখুন: তাফসির ইবনে কাসির, 'তিনি দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন'–এই আয়াতের ব্যাখ্যায়।)

{১২}পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আমার সম্মানিতা মাতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর শেষ রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে, তখন আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিলাম, "হে আল্লাহ! কী হতে যাচ্ছে?"তখন হযরত সাহেব বললেন, "এটাই তো সেই বিষয়, যা আমি আগেই বলে আসছিলাম।"

এই অধম সংক্ষেপে নিবেদন করছি যে, ২৫ মে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ, সোমবারের সন্ধ্যায় হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। রাতে ইশার নামাজের পর আমি বাইরে থেকে ঘরে এসে দেখি, তিনি আমার মায়ের সঙ্গে খাটের উপর বসে খাবার খাচ্ছেন। আমি আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাতের শেষ প্রহরে, ভোরের কাছাকাছি, আমাকে জাগানো হলো–অথবা হয়তো মানুষের চলাফেরা ও কথাবার্তার শব্দে আমি নিজেই জেগে উঠি। তখন দেখি, হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) ডায়রিয়ার কারণে মারাত্মকভাবে অসুস্থ এবং অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। চিকিৎসক ও অন্যান্য লোক তাঁকে সেবাযত্নে ব্যস্ত ছিলেন। আমি যখন প্রথম তাঁর দিকে তাকালাম, তখন আমার হৃদয় ভেঙে পড়ল, কারণ এর আগে কখনো তাঁকে এমন অবস্থায় দেখিনি। আমার মনে দৃঢ়ভাবে ধারণা হলো যে, এটি মৃত্যুর রোগ। সে সময় তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

এদিকে ডাক্তার যখন নাড়ি পরীক্ষা করলেন, তখন নাড়ি পাওয়া গেল না। সবাই মনে করল যে তিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং হঠাৎ করে চারদিকে এক গভীর নীরবতা নেমে এলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর নাড়িতে আবার স্পন্দন ফিরে এলো, যদিও অবস্থা আগের মতোই সংকটাপন্ন রইল। ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে, এবং হযরত মসীহে মওউদের খাটটি বাইরের আঙিনা থেকে তুলে ভেতরের কক্ষে আনা হলো।

যখন একটু আলো হলো, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "নামাজের সময় হয়েছে কি?"সম্ভবত শাইখ আবদুর রহমান সাহেব কাদিয়ানি আরজ করলেন, "হুজুর, হয়ে গেছে।" তিনি বিছানার ওপর হাত মেরে তায়াম্মুম করলেন এবং শুয়ে শুয়েই নামাজ শুরু করলেন। কিন্তু সেই অবস্থায়ই এক ধরনের অচেতনতা তাঁকে আচ্ছন্ন করল এবং তিনি নামাজ সম্পূর্ণ করতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ফজরের নামাজের সময় হয়েছে কি?" নিবেদন করা হলো, "হুজুর, হয়ে গেছে।" তিনি আবার নিয়ত বাঁধলেন, কিন্তু তিনি নামাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন কি না, তা আমার মনে নেই। সে সময় তাঁর অবস্থা ছিল তীব্র কষ্ট ও অস্থিরতার।

প্রায় আটটা বা সাড়ে আটটার দিকে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি বিশেষভাবে কোন কষ্ট অনুভব করছেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিতে পারছিলেন না। তাই কাগজ, কলম ও দোয়াত আনা হলো। তিনি বাম হাতের উপর ভর দিয়ে বিছানা থেকে সামান্য উঠতে চেষ্টা করে লিখতে চাইলেন, কিন্তু কষ্টেসৃষ্টে দুই–চারটি শব্দই লিখতে পারলেন। অতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে কলম কাগজের উপর টেনে চলতে লাগল, এরপর তিনি আবার শুয়ে পড়লেন। এটি ছিল তাঁর শেষ লেখা–যাতে সম্ভবত জিহ্বা বা বাক্ প্রকাশের কষ্টের কথা ছিল, তবে এর কিছু অংশ অপাঠ্য ছিল। এই লেখাটি আমার মায়ের হাতে দেওয়া হয়।

নয়টার পর হযরত সাহেবের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর 'ঘড়ঘড়ে শ্বাস' শুরু হয়। এতে কোনো শব্দ ছিল না, বরং শ্বাস–প্রশ্বাস দীর্ঘ ও টানটান হয়ে আসছিল। সে সময় আমি তাঁর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এই অবস্থা দেখে আমার মাকে–যিনি পাশের ঘরে ছিলেন–সংবাদ দেওয়া হলো। তিনি গৃহের কয়েকজন মহিলাসহ এসে খাটের পাশে মাটিতে বসে পড়লেন।

এ সময় লাহোরের ডা. মুহাম্মদ হুসাইন শাহ সাহেব তাঁর বুকে, স্তনের কাছে একটি ইনজেকশন দেন, যার ফলে সেই জায়গাটি সামান্য ফুলে ওঠে, কিন্তু কোনো উপশম দেখা যায়নি। বরং কিছু লোক এতে অসন্তোষ প্রকাশ করল যে, এমন অবস্থায় কেন তাঁকে এই কষ্ট দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ ঘড়ঘড়ে শ্বাস চলতে থাকে এবং প্রতিটি শ্বাসের মাঝের বিরতি ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি একটি দীর্ঘ শ্বাস নিলেন, আর তাঁর পবিত্র আত্মা রফীক–ই–আ'লার দিকে উড্ডীন হলো।

হে আল্লাহ! তাঁর উপর এবং তাঁর অনুগতজন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন। (চলবে)

(সীরাতুল মাহদী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭–১০, মুদ্রিত: কাদিয়ান)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir